বাঁশ

তরীকুল ইসলাম

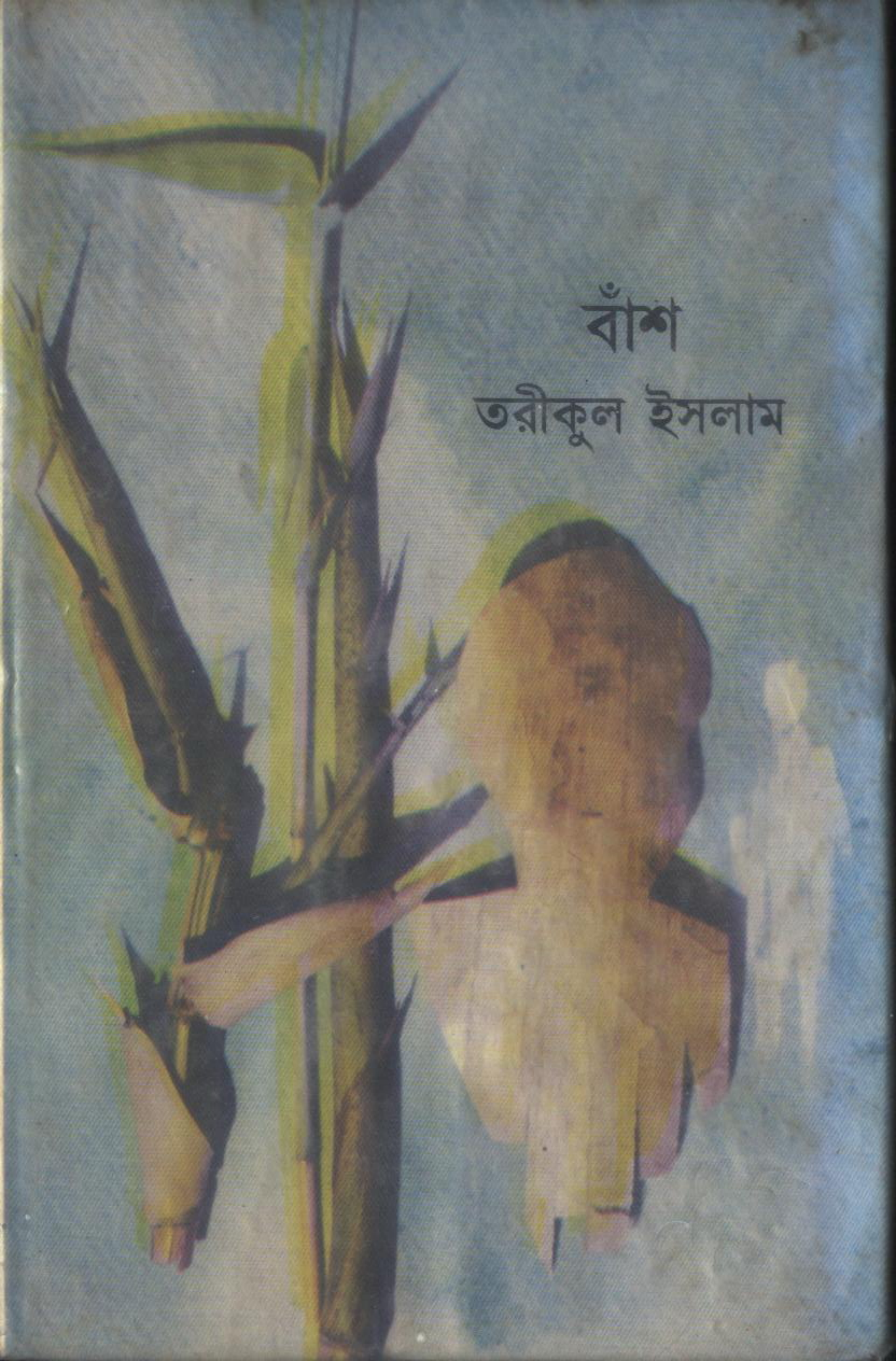

CONVERTED TO PDF

BY

--- RoNy

E-mail: tanvir_ahmad_rony@yahoo.com

(c) **Tanvir Ahmad rony**

Mechanical Engineering , Batch -2004

KUET

প্রকাশকাল

জানুয়ারী ১৯৯৭

প্রকাশক

আনোয়ারুল ইসলাম

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা

মোঃ মারুফ উজ-জামান

সহযোগিতা

মোঃ আব্দুছ ছামাদ

শব্দ বিন্যাস

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও

সিলিকন ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কম্পিউটার্স

১১১, ১৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ

বিকল্প প্রিন্টিং প্রেস

পুরানা পল্টন, ঢাকা

প্রচ্ছদ

শামসুর রহমান নিকেল

দাম

পয়তাল্লিশ টাকা

ISBN:

উৎসর্গ পত্র

বাংলা ১৪০০ সালের শুরুতে-

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি-

আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, গিয়াস কামাল চৌধুরী

বেলাল চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, দবিরুল ইসলাম চৌধুরী

ডাঃ বি. চৌধুরী, ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কে-

ভূমিকা

দু'চার লাইন লিখে ছাপাতে পেরেছি বলে- 'মুই কি হনুরে'। এরকম একটা ভাব আমার কথাবার্তায়, লেখায় কিংবা চিন্তাধারায় যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে অগণিত সুধী পাঠক আমার দৃষ্টতা ক্ষমা করবেন।

বিভিন্ন পাঠকের থাকে বিভিন্ন খোরাক, মনের খোরাক যোগাতে গিয়ে লেখকদেরকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। তারপর সে সব অভিজ্ঞতাকে রসময় ভাবের জারক রসে রঞ্জিত করে পাঠকবৃন্দের আনন্দের জন্য, উপভোগের জন্য পরিবেশন করতে হয়। যিনি এ ব্যাপারে পারঙ্গম তিনি সফল ও সার্থক লেখক। যিনি অপরাগ তিনি অসফল ও ব্যর্থ লেখক। লেখক হিসেবে যারা ব্যর্থ আমি তাদেরই একজন। কারণ আমি আমার সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

তিক্তরস যেমন দেহের জন্য কল্যাণকর, সমালোচনার তিক্তরসও লেখকের সৃজনশীলতার জন্য কল্যানকর-একথা মনে রেখেই লেখককে কলম চালনা করতে হয়। আমিও সমালোচনা সহ্য করার নিমিত্তে দৈনিক চামড়া মোটা ও শক্ত করার প্রচেষ্টায় আছি এবং নিয়মিত তিক্তরস সেবন করছি।

জীবনে চলার পথে সাধারণ মানুষের কাতারে মিলে মিশে যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি তার সাথে নিজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা নতুন রচনা নির্মাণের চেষ্টা করেছি। এতে করে আমার মনে হয় সৃষ্টির চেয়ে অনাসৃষ্টি বেশী হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে যারা মুনাফাখোর, সূদখোর, ঘুষখোর, হারামখোর খবিস, মজুদদার, কালোবাজারী, 'সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয়', - আজ তারাই সমাজের কেষ্টু-বিষ্টু, সমাজে তারাই মাথা উঁচু করে দন্ডায়মান, নির্বাচনে তারাই বিজয়ীদের দলে। সত্য তাদের কাছে নির্মমভাবে পর্যুদস্ত প্রতিনিয়ত। কবির ভাষায় বলা যায় ঃ 'সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি ? এহেন অস্বাস্থ্যাকর ও অসুন্দর পরিবেশে সুন্দর কিছু নির্মাণ করা সত্যি বড় কঠিন কাজ। এটা নির্মাণকারী ছাড়া অন্য কেউ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন না। তাই আর দশজন লেখকের মত অত্যাচারীদের রক্ত চক্ষুর ভয়ে চুপি চুপি একা একা নীরবে একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করছি আর প্রকাশের যন্ত্রনায় অনুক্ষণ ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি। বুকের মধ্যে অনুভব করছি আখমাড়াই কলের বিকট প্রতিধ্বনি।

কিন্তু বুকের পাঁজরের নিভৃত অলিন্দে একটা ক্ষুদ্র দীপ শিখা এখন ও মিটমিট করে জ্বলছে। একই ক্ষুদ্র শিখার ক্ষীণ আলোটুকু এক সময় বিরাট আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে অত্যাচারীদের সুরম্য প্রাসাদগুলোকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করবেই।

তরীকুল ইসলাম

সূচিক্রম

জীবনেও বাঁশ মরণেও বাঁশ/

জুতা সমাচার/

ছাগল সমাচার/

গাধা কত প্রকার ও কি কি ?/

রেয়ার কালেকশন/

পাঠকের প্রত্যাশা/

প্রাত্যাহিক জীবনে 'অতি' নামক একটি বিপজ্জনক শব্দ/

শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবনে দাম্পত্য কলহ/

ক্রমেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি (চিঠি)/

স্বাধীনতা ঃ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য/

চারদিকে সন্ত্রাসের বিপুল বিস্তার/

সেই ভয়ংকর শত্রুগুলো এখনো বহাল তবিয়তেই আছে/

বই চোর/

আমাদের সব বুদ্ধিজীবিরা কি দেশ প্রেমিক ?/

মাত্র তিনটি জিনিস চাই/

খাওয়া-দাওয়ার রকমফের/

গণতন্ত্র একটি রাক্ষস কবলিত রাজকণ্যা/

কেমন আছি/

সঞ্চয়ের গুরুত্ব/

আলোর নীচে অন্ধকার/

যখন পোকায় কিছু কাটে/

জীবনেও বাঁশ মরণেও বাঁশ

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বাঁশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাঁশ সমন্ধে আর কিছু না লিখে এই একটা কথা লিখলেই যথেষ্ট। কথায় বলে-পরিবারের মধ্যে ছেলের মত ছেলে একটা থাকলেই হয়-ঠিক তেমনি ভাবে কোন সভায় কথার মত কথা একটা বলতে পারলেই যথেষ্ট, ঠিক একই ভাবেই বলা যায়- বাঁশের মত বাঁশ একটাই যথেষ্ট।

এ যুগে অবশ্য কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয় কিন্তু প্রাচীনকালে গ্রামবাংলায় আমরা দেখেছি বাঁশের চটা দিয়ে সদ্যজাত শিশুদের নাড়ী কাটা হতো। তখনকার দিনে সেটাই ছিলো বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য দু'য়েকটা যে দুর্ঘটনা হতো না তা নয়। তবে সে দুর্ঘটনাকে স্বাভাবিকবভাবেই মেনে নেয়া হতো। আর বর্তমানে বিজ্ঞানে নব নব প্রযুক্তির ফলে প্রসূতি টেরও পায় না শিশু কত সহজে পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। মৃতদেহকে কবরস্থ করার জন্য বাঁশের কোন বিকল্প নেই। হিন্দুমতে শ্মশানে শবদাহ করার সময় বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বাঁশের ব্যবহারকে কোনক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

বাঁশ যে কেবল আমাদের উপকার করে তা নয়, অপকারও করে এবং সে অপকারটা খুব নিষ্ঠুরভাবে ও নির্লজ্জভাবে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা করে থাকেন। তাই কবির ভাষায়, কবির ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বলতে ইচ্ছা করে ঃ

ভগবান তুমি বাঁশ পাঠিয়েছ বারে বারে
....দয়াহীন সংসারে.....
তারা বলে গেল অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।

সেই কবিতাটি কতবার যে পড়েছি তার হিসেব আমি কেন এই উপমহাদেশের কোন বঙ্গভাষীই দিতে পারবেন না। কবিতাটির নাম 'কাজলা দিদি' খুব সম্ভব কবির নাম যতীন্দ্রমোহন বাগচী। ভুল হলে ক্ষমা চাই।

"বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ
মাগো, আমার শোলক বলা কাজলা দিদি কই?"

বর্তমান জামানায় কুটীরশিল্পে বাঁশ যে কত অবদান রাখছে তা বলে শেষ করা যায় না। বাংলাদেশের বহু লোক বাঁশ-বেতের জিনিষ বানিয়ে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। বাঁশ ও বেতের নির্মিত বহু সৌখিন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে । বাঁশ তাই গর্বের বস্তু ও ঐতিহ্যবাহী। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। এই ঐতিহ্যের কথা

আমাদের আগামী বংশধরকে অনুপ্রাণিত করবে সগৌরবে।

বাঁশ কোথায় লাগে না বলুন। গরুর গাড়ী, ঠ্যালা গাড়ী বানাতে চান—বাঁশ লাগবে। খড়ের বাড়ী বানাতে চান- বাঁশ ছাড়া উপায় নেই। শাড়ী বানাতে চান- বাঁশ লাগবে। গ্রামবাংলার অসংখ্য তাঁতী ভাইদের প্রধান অবলম্বন শুধু সূতো নয়- বাঁশ-ও। একজন কর্মকারের প্রধান যে বস্তু তা হলো হাঁপর। আর এই হাঁপরকে চালাতে গেলে দরকার বাঁশ এর ফালাটি। মাঝি যে নৌকা চালায় সেখানেও বাঁশের প্রয়োজন। দাঁড়, বৈঠা, মাস্তুল এবং নৌকার পাটাতন নির্মাণে বাঁশের প্রয়োজন অপরিহার্য। সারা জীবন ধরে আমরা বাঁশ নিয়ে খেলছি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। আর এ খেলায় কেউ বিজয়ী হচ্ছি কেউবা হচ্ছি বিজিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঁশের লাঠি উপেক্ষিত নয় বরং বহুল আলোচিত। বাংলার মেরুদণ্ড কৃষক। কৃষকের উপকরণ হাল, বলদের মুখে-আঁটা (অনেকটা নির্যাতিত নিরক্ষর, নিষ্পেষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত মানুষের মত) টুনি-মাথার মাথাল—এমনকি হাতের পাঁচনটি-ও (যা দিয়ে বলদকে ঘা দেয়া হয়) বাঁশের নির্মিত। দুঃখিত, বলদের ঘাড়ের জোয়ালটিও বাঁশের।

দেখলেন তো বাঁশের মহিমা। ভাবছেন বাঁশ এর কথা খতম! জ্বি না বাঁশ নিয়ে মহাকাব্য লিখলেও এর মহিমা শেষ হবে না।

আসুন কানে কানে একটা কথা বলে রাখি। আপনি যদি কাউকে বাঁশ দিতে চান—তা হলে আপনাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। তবে এই সংগে আরেকটি কথা-ও বলে রাখি। আপনাকে-ও কেউ বাঁশ দিতে পারে এ কথাটা-ও বিস্মৃত হবেন না। সজাগ থাকবেন হরহামেশাই। অতীতের সঞ্চিত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি কার বাঁশ কোনখান দিয়ে কোথায় যাবে কেউ সঠিক করে বলতে পারেন না।

বাঁশ লেন-দেন এর ব্যাপারটাই মজার ব্যাপার। বাঁশ দিতে-ও মজা, বাঁশ নিতে-ও মজা। আর মাঝখানে একদল নিন্দুক আছে—তারা চুপিচুপি আড়াল থেকে কেবল গিরা গুনতেই ভালবাসে। হায়রে মূর্খ মানুষ! তোমার অজান্তেই কে বা কারা যে তোমার পশ্চাদদেশে লম্বা একটা বাঁশ আগে থেকেই আলতো করে ঠেকিয়ে রেখেছে তা তুমি ইয়াদ করোনি। ঐ যে কথায় বলে না-'ঘুঁটা পুড়ে গোবর হাসে'। ছোট একটা দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। একজন কানা লোক তার একটি পাকা আমের গাছ পাহারা দিচ্ছিল। যেন সে গাছের আম বাদুড়ে খেতে না পারে। তার হাতে ছিল একটি লম্বা বাঁশ। রাতের আঁধারে সে ওটা নাড়াতো আর বাদুড় তাড়াতো। এক দুষ্ট লোক রাতের আঁধারে আমগাছে উঠে পাকা আম খাচ্ছিল আর বলছিল ঃ কার আম কে খায়? কানা লোকটি তার জবাবে বাঁশ নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলেছিল ঃ কার বাঁশ কার পাছায় যায়। দেখলেন তো বাঁশের অলৌকিক মহিমা!

আমাদের পাশের গ্রামের একটি লোক ছিল। তার নাম ছিল নসু কানা। কিন্তু তার দু'টি অলৌকিক গুণ ছিল। একটি আজান ধ্বনি, আর অন্যটি হ'ল বাঁশ হাতে ধরেই বলে দিতেন সেটা কাঁচা অথবা পাকা। একবার যদি তার আজান কেউ শুনতো (সে যে ধর্মেরই হোক না কেন)। তা হলে সে থমকে দাঁড়াতো আর নিবিষ্টমনে আজান শুনতো। আহ্ কি মধুর সে আজানের ধ্বনি ভোলা যায় না। আজানের সুর যে মানুষকে পাগল করতে পারে তা নসু কানার আজান না শুনে বিশ্বাস করা যাবে না। নসু কানা সেই কত বছর আগে

মারা গেছে কিন্তু তার আজানের সুমধুর ধ্বনি আজো 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যায়।' আপনাদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে আজানের সঙ্গে বাঁশের কি সম্পর্ক? আমি বলব সম্পর্ক একটা আছে। কারণ আজান দেবার সময় একটা মাইক লাগে। আর সেই মাইকটা বাঁশের আগায় বাঁধতে হয়। বাঁশটা অবশ্যই লম্বা হতে হয়। আর সেই মাইকের শব্দটাও অনেক দূর অবধি বিস্তৃত হতে পারে। বাঁশের সংগে আমরা কম-বেশী কোন না কোনভাবে স্বল্পক্ষণ বা দীর্ঘক্ষণের জন্য হলেও সম্পর্কিত। একদল বাঁশ বিক্রি করছেন আরেকদল কিনছেন। যেমন বাজারে অন্যান্য জিনিষ কেনাবেচা হয় ঠিক সে রকমই। বাঁশ কেনা-বেচা করে অনেক লোকই ধনকুবের হয়ে গেছে। ছোটবেলায় বন্যার সময় দেখেছি

নদী দিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে
বাঁশ ব্যবসায়ীরা ভেলার মতো সাজিয়ে
বাঁশ আনত বিক্রি করতো।

ভেলার উপর যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করতো তারা সেই বাঁশের ভাসমান চাতালের উপরই খাওয়া-দাওয়া করতো, পাক করতো এমনকি টয়লেটেরও ব্যবস্থা থাকতো চাতালের উপর। ব্যবসায়ীরা ঘাটে ঘাটে সেই চাতাল থামাতো এবং বাঁশ বিক্রি করতো। ইদানীং একটা প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ যদি আধুনিক যুগের লঞ্চ, স্টিমার, মটরচালিত নৌকা, প্রভৃতির পরিবর্তে বাঁশের চাতাল একটা শক্তিশালী মেশিন দিয়ে চালানো যায় তাহলে কেমন হয়? মেশিন যদি কখন-ও বিকল হয়, দাঁড় বেয়ে বেয়ে ঘাসি নৌকার মত বিলম্বে হলেও গন্তব্যস্থলে এক সময় যাবেই। আমি জানি না আমার এই অবৈজ্ঞানিক প্রস্তাবটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন কিনা। আমার মনে হয় আমরা যদি আবার সেই আগের দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারতাম তা হলে বেশ মজা হতো তাই না? প্রতিদিন এত মৃত্যুর খবর পড়তে পড়তে নিজের নামটাও অজান্তে সেই তালিকায় চলে যায়। যে কোন মৃত্যুই বেদনাদায়ক। বিজ্ঞানের অবদানকে এখন আর আশীর্বাদ মনে হয় না, মনে হয় অভিশাপ।

পেট্রোলকে বর্তমানে বলা হয় তরল সোনা। তাহলে বাঁশকে বলতে হবে সোনার বিস্কুট। বাঁশ ছাড়া আমাদের জীবন-প্রবাহ অচল। সম্প্রতি একটি মজার প্রতিবেদন টিভির মিনি পর্দায় আমরা দেখেছি। জনৈক বাড়ীওয়ালা তার ৩/৪ তলা বাড়ী কেবল বাঁশ দিয়ে নির্মাণ করেছেন। সেখানে বহু ভাড়াটিয়া স্বল্প-ভাড়ায় বসবাস করেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে এটা বাড়ীওয়ালার একটা মহানুভবতা। না, তেমন কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি। ভূমিকম্পের জন্য এই বাঁশ নির্মিত বাড়ীটি খুবই নিরাপদ।

আমরা খনার বচনে পাই ঃ

'দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ
কমে না বাড়ে বারো মাস।'

অনুরূপ আরেকটি বচন আছে ঃ

'আমের আনা মাছের পাই
হলে কে কত খায়।'

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যতরকম দরকারী জিনিষপত্র লাগে সব কিছুই বাঁশ দ্বারা

নির্মিত। সুতরাং বাঁশকে কোনক্রমেই অবহেলা করা চলবে না। চেয়ারের একমাত্র বিকল্প মোড়া যা আমাদের ঐতিহ্য বহনকারী। চেয়ারের পরিবর্তে কাউকে মোড়ায় বসতে দিলে আগন্তুক সেটাকে অবমাননাকর মনে করেন না। গ্রামবাংলায় এখনও অসংখ্য গরীব জনসাধারণ বাঁশের মাচানে খড়ের ঘরে দিব্যি আরামে জীবন যাপন করেন। ঝড়ের সময় অসুবিধা হয় ঠিক তবে ভূমিকম্পের সময় খড়ের ঘরই বেশী নিরাপদ। প্রকৃতি বোধহয় এভাবেই ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। তাই বাঁশকে বলা হয় Poor man's timber.

আমাদের চলমান সমাজ জীবনে বাঁশের ভূমিকা বড় বিচিত্র। আলেকজাণ্ডার বলেছিলেন, সেলুকাস-বিচিত্র এই ভারতবর্ষ আরো বিচিত্র এই ভারতবর্ষের মানুষের মন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার জানতেন না এই দেশের বাঁশের বিচিত্র ব্যবহার।

এক পক্ষ আরেক পক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাঁশ লেনদেন করছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ক্ষমতাসীন সরকার নিরীহ জনগণকে বাঁশ দিচ্ছেন কখনও 'ক্লিন' কখনো 'আন-ক্লিন'। যেহেতু অধিকাংশ জনগণ অধিকার সচেতন নন তাই তারা নীরবে নিঃশব্দে নিভৃতে কষ্ট সহ্য করে সেই বাঁশ খাচ্ছেন। আরেকদল সুচতুর লোক নিরাপদ দূরত্বে বাস করে সেই ঢুকানো বাঁশের গিরা গুনছেন এবং উপভোগ করছেন। কারণ আমরা চিরদিন উপভোগ বিলাসী লোক। পঁচানব্বই জন লোকের ফাঁসি হয়ে যাক কেবল আমি বাঁচতে পারলেই বেঁচে গেলাম—এ রকম এক বিচিত্র মনোভাব আমাদের ভিতরে ক্রিয়া করে। কিন্তু উপভোগ বিলাসীরা জানেন না একজনের ঘরে যখন আগুন লাগে পাশের বাড়ীটিও নিরাপদ থাকে না। তখন সেই বাড়ীর লোক যে কোন ধর্মেরই হোক বা যে কোন র‍্যাংকেরই হোক তিনিও নিরাপদ নন। আগুনের ধর্ম হচ্ছে পোড়ানো সেখানে স্ট্যাটাসের প্রশ্ন অবান্তর।

সুযোগ বুঝে অফিসের ছোট সাহেব বড় সাহেবকে বাঁশ প্রদান করছেন আবার এটার জের হিসাবেই বড় সাহেব ছোট সাহেবকে অকাতরে 'আন-ক্লিন' বাঁশ প্রদান করছেন এবং মনে মনে হাসছেন আর স্বগোতোক্তি করছেন ঃ হোরের পো (শ্বশুরের ব্যাটা) জানো না ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়? পারিবারিক জীবনে-ও এই বাঁশের খেলা নীরবে নিরবধি চলছে নদীর স্রোতের মতই। কখনও স্বামী স্ত্রীকে বাঁশ দিচ্ছেন, স্ত্রী স্বামী বেচারীকে বাঁশ দিচ্ছেন।

বিদেশ গমনেচ্ছু গরীব বেচারীরা (যারা হালের বলদ, ফসলের এক টুকরা জমি- যা জীবনের একমাত্র সম্বল, বউ এর গয়না ঘামের বিনিময়ে স্বোপার্জিত জমানো ব্যাংক ব্যালান্স, ধারের টাকার বিনিময়ে) আদম বেপারীর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে বাঁশ খাচ্ছেন। এত কিছুর পরেও তাদের শিক্ষা হচ্ছে না। বোকামী করে, ভাবালুতার সাগরে ভেসে ভেসে সেধে সেধে আদমের কাছে বলির পাঁঠার মতো গলা আগিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমান যুগটাই বিজ্ঞাপণ আর বিজ্ঞানের যুগ। চারদিকে চলছে বিজ্ঞানের জয়-জয়াকার। বিদ্যুতের নিয়ন বাতির সুদৃশ্য আলোকে যখন সমগ্র পৃথিবী স্নান করছে তখন-ও কিন্তু বাঁশের গবেষণা বন্ধ হচ্ছে না। এ অবস্থাতেও ইংল্যান্ডের মত সুসভ্য দেশেও Bamboo Research Institute হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও ভাল বাঁশ কি করে তৈরী করা যায় তার চিন্তা-ভাবনা চলছে। বাঁশের বিভিন্ন রোগ নিয়ে সেমিনার হচ্ছে। ডাক-সাঁইটে ডিগ্রীধারী বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন বাঁশ নিয়ে গবেষণা করছেন। বাঁশকে

তারা অবহেলা করছেন না বা উপেক্ষার বস্তু হিসেবেও গণ্য করছেন না।

বর্তমানে জনসংখ্যার নির্মম চাপে বাঁশ বাগান উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আর বাদ বাকি যা দু'চারটা দেখা যাচ্ছে (টাক মাথার অবশিষ্ট চুলের মত) সেগুলোও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিরাট একটা আশংকার ব্যাপার। এখন থেকে আমাদেরকে বাঁশ-সচেতন নাগরিক হতে হবে। রাজনীতি সতেচন না হলে জনগণ যেমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, বাঁশ সচেতন না হলেও জনজীবন বিপর্যস্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সুউচ্চ বিল্ডিং নির্মাণে ব্যস্ত। কিন্তু নির্মাণ কাজেও প্রচুর বাঁশের প্রয়োজন পড়ে- এ কথাটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। অতএব হাঁস চাষের সংগে বাঁশ চাষের ব্যাপারেও আমাদেরকে মানে আমাদের সরকারকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। এর কোন বিকল্প পথ নেই। ইট পোড়ানোর জন্য এবং গ্রামবাংলার মানুষের জ্বালানির জন্য প্রতিদিন বন-জঙ্গল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে Ecological Balance-ও রক্ষিত হচ্ছে না। আমাদের দেশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। শস্য-শ্যামলা, সুজলা-সুফলা এই অসম্ভব সবুজের দেশ দিন দিন শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। এই অসম্ভব সবুজের কারণেই এদেশের মানুষের মন ছিল অবুঝ। আর এই অবুঝের কারণেই এ সমস্ত অবুঝ মানুষকে কবিরা, গীতিকাররা বলতো—সোনার দেশের সোনার মানুষ। আর সেই সবুজ দামাল ছেলেরা আজ হয়েছে টাউট, বাটপার, ছিনতাইকারী, ধান্দাবাজ, ইবলিসের চ্যালা। সেই দামাল ছেলেরা বন্ধুকের বাঁট দিয়ে স্বাধীন দেশের নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে পথের কাঙাল বানাচ্ছে। একেই কি বলে স্বাধীনতা? এসব করার জন্য কি শেখ মুজিব বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়? মুরুব্বীরা একটি আদর্শ বাড়ীর অবস্থান সম্পর্কে বলেন ঃ

"পূর্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ
উত্তরে সূয়া, দক্ষিণে ধূয়া"

দেশে নানা প্রকারের বাঁশ আছে। তার প্রকারভেদ ও পরিচিতি দেয়া এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কারণ এটা একটা বিশাল অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য নামগুলো এরকম ঃ বড় বাঁশ/বড়ুয়া বাঁশ/বালকো বাঁশ। এদের ইংরেজী নাম ব্যাম্বুসা বেলকোয়া। আরেক জাতের বাঁশ আছে। যেগুলোর স্থানীয় নাম ঃ মাকলা বাঁশ/কাটাজলী/তল্লাবাঁশ/জাওয়া বাঁশ/মিতিংগা বাঁশ ইত্যাদি। এদের ইংরেজী ব্যাম্বুসা টুল্ডা।

মনুষ্য সমাজে দুর্ভিক্ষ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব যেরূপ, বাঁশের বাগানেও সেরূপ মড়ক দেখা দেয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে একবার মড়ক দেখা দিয়েছিল এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলের বাঁশ চাষীদের হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার।

এ ছাড়া লম্বা বাঁশ, খাটো বাঁশ, মোটা বাঁশ, পাতলা বাঁশ, কাঁচা বাঁশ, পাকা বাঁশ, আমরা ঘরের বিভিন্ন কাজে লাগাই। তবে তল্লা বাঁশ দিয়ে সূক্ষ্ম কাজগুলোই বেশী হয়ে থাকে। তল্লা বাঁশের বাঁশীর সুর আর মরহুম আব্বাসের মিষ্টি গলার গান মনকে একেবারে পাগল করে তোলে। তখন কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি বাঁশীর কাছে নির্মমভাবে পরাজিত হয়। বাঁশী বাজিয়ে কত যুবক যে বাংলার ললনাকে ঘরছাড়া করেছে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলা সাহিত্যের বিরাট এলাকা জুড়ে আছে বাঁশের বাঁশী।

আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি বাঁশের কোন বিকল্প নেই। সুতরাং বাঁশ সম্পর্কে যে

সৌখিন ব্যক্তির জুতা এবং কৃপণ ব্যক্তির জুতার ভিতর আকাশ-জমিন তফাৎ। যিনি সৌখিন ব্যক্তি তার ফার্স্ট আইটেমই হলো 'জুতা'। এবং দামী জুতা। নামজাদা কোম্পানী হতে হবে। রোলেক্স জুতার প্রসিদ্ধি এখনও বাজারে চালু আছে। 'রোলেক্স' এর ঘড়িও বিখ্যাত। এই কোম্পানীর গাড়ীও নামকরা। এবার কৃপণ ব্যক্তির কাছে—তার প্রথম কথাই হলো ৫০০ টাকার জুতাকেও মানুষ জুতা বলবে আবার ৫ টাকার জুতাকেও মানুষ জুতা বলবে। বেশী দাম বলে সেটা 'জুতা সাহেব' হবে না। তা ছাড়া জুতাতো পায়েই থাকবে। সুতরাং পায়ের জুতা বেশী দামে কেনার অর্থই হলো টাকার অপচয় বা অপব্যয়। আর হাদিস মোতাবেক ঃ অপব্যয়কারী হলো শয়তানের ভাই। কৃপণ ব্যক্তির নমুনা হলো ঘাড়ে থাকবে তার একটি ময়লা সার্ট এবং পায়ের জুতা থাকবে হাতে।

বলা বাহুল্য সেটা রবারের জুতা। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বাটা কোম্পানীর জুতার জগৎ জোড়া খ্যাতি এখনও অম্লান। এই কোম্পানীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দাম পুরোপুরি থাকবে না। অর্থাৎ ১০০ টাকার জুতার দাম হবে ৯৯.৯৫ টাকা। এটাই হলো বাটার বৈশিষ্ট্য। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো দামে সস্তা এবং টেকসই। সর্বোপরি আরামদায়ক। এটা কোম্পানীর ভাষায়। আজ থেকে ১৭ বছর আগে নিউমার্কেটে একটি জুতার দোকানে ঢুকে পড়লাম জুতা কেনার জন্য। বেশ কয়েক প্রকার জুতা দেখার পর এক জোড়া পছন্দ হলো। মূল্য নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটিও হলো। এক প্রসংগে জুতা বিক্রেতা বলল ঃ দেখুন স্যার, আমরা কাউকে কষ্ট দিয়ে পয়সা নেই না। আমি সংগে সংগে এ কথার প্রতিবাদ করে বললাম ঃ আপনার কথাটি সর্বাংশেই ভুল। কারণ প্রথমেই আপনারা দামটা রেখে দেন পরে জুতা পায়ে দিয়ে আমরা কষ্ট পাই এমনকি পায়ে ফোস্কাও পড়ে যায়।

জুতা বিক্রেতা বলল ঃ স্যার বিগত চল্লিশ বছর এই দোকানে আছি কেউ এমন ধরনের কথা বলেনি। একটি মাত্র কথায় তার চল্লিশ বছরের ভ্রান্ত ধারণার হলো অবসান। অমর কথাশিল্পী ডঃ মুজতবা আলী জুতা নিয়ে যে রসিকতা করেছেন তা অবিস্মরণীয়। সেই পাঠান আবদুর রহমান যখন জুতা কালি করছিল তখন তাকে দেখে লেখকের মনে হলো ঃ কোন প্যারিস সুন্দরীও বোধহয় এতটা মনোযোগ দিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগায় না। অন্য আরেক জায়গায় আলী সাহেব বলেছেন একটি সুন্দরী মেয়ের গালের রং তার বাদামী রং-এর জুতার মতোই চকচকে।

আমরা তো কথায় কথায় বলি ঃ জ্ঞানী লোকের জুতার বোঝা বওয়াও অনেক ভাল ঃ কিন্তু মূর্খের সংগে দোস্তি করা ভাল না। গুণীজনের কাছে তার অন্ধ ভক্তের সংলাপ ঃ —স্যার, অন্যায় করতে দেখলে আপনার পায়ের জুতাটা খুলে দুই গালে দুইটা বসিয়ে দেবেন। আরেকটি সংলাপ ঃ স্যার, আমি আপনার বাসায় থাকবো আর জুতা পালিশ করবো, তবু স্যার, আপনি আমাকে আপনার ছায়াতলে রাখেন।

কথায় বলে ঃ বেকার থাকার চেয়ে জুতা পালিশ করাও ভালো। তবে কোন কোন ছেলে বেকারত্বের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এখনও তাই করেন। যদিও এটার মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। বরং সবদিক দিয়ে নিন্দনীয় এবং গর্হিত অন্যায় কাজ। জুতা পালিশের পয়সা দিয়ে আর কিছু না হলেও চাট্টি ডাল ভাতের ব্যবস্থা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চটি জুতা পরতেন। বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর নিজের সম্পাদিত পত্রিকা

কোন প্রকার উদাসীনতা ক্ষমার অযোগ্য। কবি নজরুল কোলাহলকে সুরে পরিণত করেছিলেন, গালাগালিকে পরিণত করেছিলেন গলাগলিতে আর বাঁশকে বানিয়েছিলেন বাঁশী। আর সেই বাঁশীর মোহন সুরের মায়াজালে বাংলার আপামর জনসাধারণকে করে তুলেছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং বাঁশের ভূমিকাকে অস্বীকার করা মূর্খতারই নামান্তর। আসুন, আমরা এবার বাঁশ ও বাঁশী বন্দনায় নেমে যাই।

উপসংহারে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আজকের নিবন্ধের ইতি টানতে চাই। তবে ভবিষ্যতে কেউ যদি বাঁশ নিয়ে উৎসাহ বা কৌতূহল প্রকাশ করেন তখন আরও লিখবো বলে অঙ্গীকার করছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। জোকটি নিম্নরূপ ঃ

জনৈক বাঙালী একবার জাপানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ভদ্রলোককে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'মাই নেম ইজ ইয়াসিমুরা'। সেই জাপানী ভদ্রলোকও কৌতূহলবশতঃ বাঙালীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। উপস্থিত বুদ্ধিতে বাঙালী চিরদিনই ক্ষুরধার। তিনি সংগে সংগে বললেন ঃ মাই নেম ইজ বাঁশের মুরা'। এ জন্য কথায় বলে 'বাঙালীর মাইর, দুনিয়ার বাইর।'

জুতা সমাচার

জুতার রহস্য অনেক। পরিস্থিতির চাপে পায়ের জুতা কখন যে, হাতে এসে যায় এবং তা গাল পর্যন্ত স্পর্শ করে তা বোধকরি প্রয়োগকারী নিজেও জানেন না।

মানুষ যখন রাগে অন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সহ্য ক্ষমতা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে যায় সেই চিরন্তন কথাটি "ছেড়ে দাও, হারামজাদাকে আজ জুতাপেটা করে ছাড়বো।" সব সময়ই যে সত্যি সত্যি জুতাপেটা করা হয় তা নয়, কথাটা বলে অনেক সময় মনের ঝাল মেটানো হয়। তবে এ ধরনের ঘটনা কালেভদ্রে কখনো-সখনো কচিত ঘটে থাকে তা বলাই বাহুল্য।

পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত হয় ফুলের মালা এবং তিরস্কারের জন্য প্রদত্ত হয় জুতার মালা, সংগে কিছু চড় থাপ্পর ও জরিমানা, অনাদায়ে আরও দীর্ঘক্ষণ জুতার মালা গলায় পরে থাকা এবং নির্মম শাস্তি ভোগ করা। তবে 'জুতা' পুরস্কার হিসেবেও পাওয়া যায় যদি কেউ মনে বা রূপালী পর্দায় কোন নিকৃষ্ট চরিত্রের নিখুঁত অভিনয় দেখাতে পারেন। পুরস্কার হিসেবে এ জুতার কোন জুড়ি নেই। এ জুতা বুকের সাথে জড়িয়ে রেখে চোখ বন্ধ করে রাখা যে কি আনন্দ, যিনি পেয়েছেন তিনিই জানেন।

অনেক শক্তিমান অভিনেতা সিরাজউদ্দৌলা নাটকে মীরজাফর আর মোহাম্মদী বেগ-এর চরিত্র করতে গিয়ে 'জুতা' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার প্রিয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মীরজাফরের রোল করে 'জুতা' উপহার পেয়েছিলেন। গর্বে এবং আনন্দে সেদিন আমারও চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। মঞ্চে একটা দু'টো জুতা পড়েনি। সেদিন রীতিমত জুতার বৃষ্টিপাত ঘটেছিল। শুনেছি নট সূর্য শিশির ভাদুড়ীও নাকি তাঁর নিপুণ অভিনয়ের জন্য জুতা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বঙ্গদর্শনে লিখলেন ঃ চটি জুতা ভিজলে কি হয়? পরবর্তী একটি সংখ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র জবাবে লিখলেন ঃ চটি জুতা ভিজলে বঙ্কিম হয়। এরই নাম দাঁতভাঙ্গা জবাব। ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে আরো একটি গল্প প্রচলিত আছে সেটা বহুল প্রচলিত এবং প্রচারিত। ট্রেনের এক কামরায় দু'জন মাত্র যাত্রী। একজন ইশ্বরচন্দ্র অন্যজন ইংরেজ সাহেব। সাহেব ভেবেছিলেন তাঁকে দেখে ঈশ্বরচন্দ্র অন্য কামরায় চলে যাবেন। কিন্তু তা আর হলো না। ইশ্বরচন্দ্রের চটি জুতা সাহেব এক ফাঁকে ফেলে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র চুপচাপ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সাহেব গেলেন টয়লেটে। কিন্তু তার কোট রয়ে গেল। এই সুযোগে বিদ্যাসাগর সাহেবের কোটটি ফেলে দিলেন। সাহেব টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন তার কোটটি লা-পাত্তা। তিনি তখন চিৎকার করে বলতে শুরু করলেন "হোয়ার ইজ মাই কোট"? "হোয়ার ইজ মাই কোট"? বিদ্যাসাগর তা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন ঃ "ইওর কোট হ্যাজ গান টু ফেচ মাই স্যুজ"। সাহেব চুপ করে বসে পড়লেন।

স্কুল-কলেজ-এর মেয়েদের দেখলে বখাটে ছেলেরা বিশ্রী ভাষায় মন্তব্য করে, এক টুকরা কাগজ ছুঁড়ে মারে। এমনি ধরনের আরো অনেক ইতরামী করে। পরে অবশ্য তাদেরকে সরকারীভাবে ধোলাই করা হয়। কথিত আছে একদিন বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী শামীম শিকদার (কমরেড সিরাজ শিকদারের বোন) জিনসের প্যান্ট পরে সাইকেলে চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। অমনি শুরু হলো মন্তব্য। তিনি সাইকেল থেকে নেমে সেই বখাটে ছেলেটিকে আচ্ছা করে স্যান্ডেলা ইজ করে দিলেন। মেয়েত নয় যেন খোলা তলোয়ার।

জুতার বিজ্ঞাপনের একটি নমুনা তুলে ধরছি-একজন এ্যাংলো মহিলা মিনি স্কার্ট পরে ক্যাম্বিসের জুতা পরে রিক্সা চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে দৃশ্য দেখে একজন আরেকজনকে বললেন ঃ দেখলেন তো মহিলা আমাদেরকে কেমন জুতা দেখিয়ে গেলেন? জানেন, এটা কোন্ কোম্পানীর জুতা? আরে সাহেব এটা অমুক কোম্পানীর জুতা। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র জুতা নিয়ে যে বিখ্যাত গল্প লিখেছেন তা বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গল্পটির নাম "নতুন-দা"। যাঁরা পড়েছেন তারা রস উপভোগ করার জন্য আবার পড়ুন। যারা পড়েননি তারা অবশ্যই পড়ে নেবেন। আমি একজন সামান্য লিখিয়ে তাই ভয়ে লিখতে পারলাম না। তার আরেকটি গল্প আছে। গল্পটির নাম—চটি চোর। তিনিও চটি পরতেন। কখনও কখনও স্যান্ডেল পরতেন। একদিন বেখেয়ালে তার এক পাট চটি হারিয়ে গেল কোন এক সাহিত্য সভায়। তিনি সভাশেষে একটি মাত্র চটিকে খবরের কাগজ দিয়ে পেঁচিয়ে বগলদাবা করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার বুকে নিক্ষেপ করলেন। ভাবলেন চোর ব্যাটাকে জব্দ করবেন। কিন্তু সেটাকে একটা কাগজে পেঁচিয়ে লোক মারফত শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষমেস দেখা গেল চোরকে জব্দ করতে গিয়ে নিজে জব্দ হয়ে গেলেন। ঐ চটি জোড়া তিনি খুব সখ করে তালতলা থেকে কিনেছিলেন। হারিয়ে যাবার পর তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। হাজার হোক সখের জিনিষ তো। জুতার মাহাত্ম্য যে অনেক তা যারা মৃগীর রোগী তারাই জানেন। মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা হঠাৎ করে আগুনে নতুবা পানিতে ঝাঁপ দেয়। যদি প্রাথমিক অবস্থায় নাকের কাছে জুতাটা একবার ঠেকাতে পারেন তাহলে বেঁচে গেল সে দফা।

মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত যাত্রী অথবা কোন বিদেশী যখন জুতার সোলের মধ্যে বে-আইনীভাবে স্বর্ণ পাচার করেন তখন জুতা আর জুতা থাকে না। জুতা টেলিভিশনের

দামী মিনি পর্দায় সকলের জন্য দর্শনীয় বস্তু হয়ে যায়।

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্কোস এখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নিয়েছেন। তাঁর বেগম ইমেলদা মার্কোস। তাঁর জুতা-প্রীতি পৃথিবীর মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। বেগম সাহেবার জুতার সংখ্যা ছিল ৩ (তিন) হাজারেরও বেশী। এত জুতা থাকা সত্ত্বেও বেগম সাহেবার আত্মা ছিল অতৃপ্ত।

বিখ্যাত কবি গ্যেটে একনাগাড়ে ক্রিশ্চিয়ানার সাথে ১৫ বছর ঘর করেছেন। গ্যেটে এক পর্যায়ে প্রায় 'স্ত্রৈণ'ই বনে যান। বলেন—"তোমার ক্ষয়ে যাওয়া জুতা জোড়া আমাকে দাও, আমি হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। এগুলো বুকে চেপে ধরে 'গ্যেটে ক্রিশ্চিয়ানাকে' 'প্রকৃতির শক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পোশাক প্রীতি ও পরিচ্ছন্নতাবোধ মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তাঁদের পোশাক ধোয়া হতো ফ্রান্সে। পোশাকের সংগে তাঁরা মানানসই জুতাও পরতেন। কবি মাইকেল মধু সূদন দিনে কয়েকবার পোশাক বদলাতেন এবং তার মাকে বলতেন—মা 'গৌরাঙ্গ' কোথায় গেল—আমার জুতার ফিতাটা খুলে দিতে বল।

মানব মুকুট হযরত মুহঃ (দঃ) একবার ধর্মপ্রচার-এর জন্য তায়েফে গিয়েছিলেন। সেখানে বিধর্মীরা তাঁকে নির্মম অত্যাচার করেছিলেন। আঘাতের ফলে তাঁর রক্ত জুতার সংগে এমনভাবে জমাট বেঁধে গিয়েছিলো যে, জুতা পা থেকে ছাড়ানো বেশ কষ্ট হয়েছিল।

কথিত আছে চীন দেশের লোক একদা লোহার জুতা পায়ে দিত। চীনে এখনও সৌন্দর্য নির্ণয়ে পায়ের ক্ষুদ্রত্ব প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

জনৈক বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়কে তাঁর (পাউলো রসি অথবা পেলে) অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য তার দেশের প্রসিদ্ধ জুতা কোম্পানী তাঁকে বিনামূল্যে জুতা দেবেন বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। এবং সেটা সারা জীবনের জন্য অর্থাৎ পাউলো রসি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি বিনামূল্যে জুতা পরতে পারবেন। এ এক দুর্লভ সম্মান।

মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী 'বুটস' কোম্পানী খুলে এখন সেই কোম্পানীর লাল বাতি জ্বলার উপক্রম। তার জনৈক বন্ধুকে সেই কোম্পানীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন সরল বিশ্বাসে। তার সেই বন্ধু মোহাম্মদ আলীর এই সরলতার সুযোগটাকে পুরোপুরি নিজের কাজে লাগালেন।

যে বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল তা হলো বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'জুতা আবিষ্কার' কিন্তু তা আমি উল্লেখ করিনি। কারণ আমার প্রতিপাদ্য বিষয় জুতা সমাচার বর্ণনা করতে গেলে জুতা আবিষ্কারের বিষয়টিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। এটি একটি ব্যঙ্গ রসাত্মক কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সমাজের রাজা ও মন্ত্রীকে দারুণভাবে কষাঘাত করেছেন। বর্তমানে আমরা কি দেখতে পাই? বিশেষ উপদেষ্টাদের বদৌলতে কোন নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আমরা সচরাচর দেখি না। পরিকল্পনা হয়ে কোন এক অজানা দেশে উড়ে যায়।

হ্যাঁ, এবার আসা যাক ব্যবসা-বাণিজ্যের কথায়। দেশে জুতা শিল্প অর্থনীতির এক বিরাট ভারসাম্য বজায় রাখছে। এই শিল্পকে আরও আধুনিক ও সুন্দর করা দরকার। মূল্যের ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিদের বিবেচনা করা দরকার। বিদেশী জুতার প্রতি আমাদের কোন অহেতুক মোহ যেন না থাকে। সোনার বাংলায় চারদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু তাল তাল সোনা অথচ আমাদের উপেক্ষা, অজ্ঞতা ও প্রযুক্তির অভাবে এই তাল তাল

সোনা আমাদের হাতে ছাই হয়ে ধরা দিচ্ছে।

চামড়া দিয়ে শুধু জুতাই বানানো হয় অন্য কিছু নয়? হ্যাঁ কোরাণের খাপ বানানো হয় (চামড়া রিফাইন করার পর)। বর্তমানে চামড়া শিল্প সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে বিস্তার লাভ করছে। এটা খুবই আশার কথা। আমরা যদি একটুখানি সচেতন হই তবে চামড়া রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। যা রপ্তানি হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ছোটবেলা থেকে জুতার প্রতি আমার ভীষণ দুর্বলতা আছে। ছোটবেলায় নতুন জামা এবং নতুন জুতা পেলে ওটা কাছ ছাড়া করতে চাইতাম না। আরেকটা বৈশিষ্ট্য ছিল জুতা পায়ে হাঁটলে তা যেন শব্দ করে। এবং সে শব্দটা হবে ক্যাঁচ ক্যাঁচ। অথচ এখন? জুতা পায়ে শব্দ হলে সেটা হবে গর্হিত অন্যায়। সময় বদলিয়ে দিয়েছে সেই অতীতের মানসিকতাকে।

অভিজ্ঞতার তহবিলে অনেক কিছু সঞ্চিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই বলতে পারি জুতা পেলে বড়রা আনন্দ পায় কি-না আমি জানি না তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল লাল জুতা ঈদের সময় পেলে অফুরন্ত আনন্দে নেচে উঠে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ এক অনাস্বাদিত আনন্দ। আমার ধারণা তাদের ঈদের সময় চমচমের চেয়ে নতুন জুতার আকর্ষণ বেশী। জুতা যে কেবল আনন্দ দেয় তা নয়। প্রাণনাশেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পলাতক অবস্থায় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে এই জুতার কারণেই ধরা পড়তে হয়েছিল। তারপর পিশাচ মোহাম্মদী বেগ-এর হাতে নির্মমভাবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে জুতার রকম-সকম ও পাল্টে যাচ্ছে। গুণগত মানও পালটে যাচ্ছে। জুতা ভারি ও সোল মোটা হলে আমরা তাকে বলতাম বোগদাদী জুতা। এ রকম জুতা জসীম উদদিন পরতেন। চার্লি চ্যাপলিনের জুতা ছিল দর্শকের কাছে অপরিমেয় হাসির বিষয়। পঞ্চ পাণ্ডবদের জুতা এবং দ্রৌপদীকে নিয়ে যে পৌরাণিক কাহিনী আছে আশা করি তা সকলেরই জানা আছে।

জুতা, লবণ ও কবিতার মধ্যে সাংঘাতিক একটা মিল আছে। জুতা ছোট-বড় হলে পায়ে দেয়া যায় না ; লবণ কম-বেশী হলে খাওয়া যায় না। কবিতা ছন্দহীন রসহীন এবং দুর্বোধ্য হলে তা হজম করা যায় না। উপরোক্ত তিনটি জিনিষই আমাদে অত্যাবশ্যক এবং আমাদের জীবনের সংগে সম্পৃক্ত। জুতা আপনাকে পায়ে দিতেই হবে—সেটা চামড়ার হতে পারে, রাবারের হতে পারে, কাপড়ের হতে পারে, প্লাস্টিকের হতে পারে অথবা হতে পারে সেটা গাটা পার্চা অথবা নাগরাই। গ্রামবাংলায় মধ্যবয়েসী অথবা বৃদ্ধবয়েসী লোক কোথাও গেলে সংগে থাকবে জুতা, ছাতি ও লাঠি (কম্পালসারি)। এগুলোর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। জুতা—ধূলা-কাদা থেকে, ছাতি—রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে এবং লাঠি কোন প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে জুতার বিপক্ষেও কথা আছে। জুতা যদি ভারি হয় এবং আরামপ্রদ না হয় তা হলে সে জুতা আপনার গতিকে করবে ব্যাহত। আর যদি পেরেক থাকে তা হলে আপনি হবেন বিড়ম্বিত। তাই অমর কবি শেখ সাদী বলেছেন ঃ

"খালি পায়ে হাঁটা-ও ভালো
কাঁটাওয়ালা জুতার চেয়ে
পথে পথে হাঁটাও ভাল

ঘরে স্ত্রী গঞ্জনার চেয়ে।"

কথিত আছে, এক সময় ঝগড়ার ফাঁকে শেখ সাদীর স্ত্রী তাঁকে বলেই ফেলল ঃ হ্যাঁ, গা আমার বাবা তোমাকে যেন কত দিরহাম দিয়ে কিনেছিল। এই কথা শুনে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন। জুতা যত দামেই কিনুন তাকে পায়েই থাকতে হবে। এবং এটাও সত্য যে জুতার মাধ্যমেও মানুষের রুচির আংশিক প্রকাশ ঘটে।

লবণ দৈনন্দিন জীবনে একটি অপরিহার্য দ্রব্য। লবণের দুষ্প্রাপ্যতা অতীতে অনেক সরকার এর উত্থান-পতন ঘটিয়েছে। কাজেই লবণকে উপেক্ষা ও অবহেলা করবেন না। ইতোমধ্যে কেউ হয়তো বলতে পারেন ধান ভানতে শিবের গীত কেন? হ্যাঁ অনেক সময় শিবের গীত গাইতেও হয়। প্রয়োজনেই গাইতে হয়। কাঁচা চামড়ার জন্য একমাত্র লবণই মহৌষধ। কাজেই লবণকে বাদ দিয়ে জুতার আলাপ অপ্রাসঙ্গিক। রসিকজনরা বলেন—বধূহীন বাসর আর লবণহীন ব্যঞ্জন একই।

কবিতা পড়তে ভালবাসি কারণ আমি হৃদয়ের কথা শুনতে চাই। হৃদয়ের কথা বলব তাই কবিতার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু সেই কবিতা কোথায়? যে কবিতায় হৃদয়ের কথা মউ মউ করছে। বাঁচার জন্য কবিতাও অপরিহার্য। শুধু বাঁচার জন্যই বা বলি কেন আনন্দের জন্য এবং বেদনার জন্যও কবিতার প্রয়োজন অপরিহার্য। আপনি যখন অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছেন তখন একটি ভাল কবিতা আপনাকে সেই ক্ষত থেকে অনেকটা রেহাই দেবে এটা হলপ করে বলা যায়। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে ভাল কবিতা কোনটা? যে কবিতা পাঠকের মনকে স্পর্শ করতে পারে সেটাই ভাল কবিতা।

আবার ফিরে আসি জুতা প্রসঙ্গে। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করলো ভাই, কেমন আছেন? উত্তরদাতা বললেন ঃ আছি ভাই ভালই তবে খুবই ব্যস্ত। কারণ অফিসের সব লোক এখন ছুটিতে তাই "জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ আমাকেই করতে হচ্ছে।"

গ্রামবাংলায় ঠাট্টা করে বলা হয়—ঐ ব্যাটারা জুতায় সোজা। বোধগম্য না হলে কথাটা প্রথমে কঠিন মনে হবে কিন্তু বুঝতে পারলে আর কঠিন মনে হবে না। যেমন ডান পায়ের জুতা ডান পায়ে এবং বাম পায়ের জুতা বাম পায়ে লাগাতেই হবে। কেননা বাম পায়ের জুতা ডান পায়ে লাগবে না। কথাবার্তা উল্টা পাল্টা করে এদিক-সেদিক চালিয়ে দেয়া যায় কিন্তু ডান পায়ের জুতা বাম পায়ে দেয়া যায় না। কারণ এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ জন্য কোন কোন ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে কটাক্ষ করে বলা হয় 'সব ব্যাটাই জুতায় সোজা।' কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটা অযৌক্তিক না। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে—যার জ্বালা সেই জানে' যার ইংরেজীটা এরকম—The wearer best knows where the shoe pinches. এটা অত্যন্ত অর্থবহুল এবং সঙ্গতিপূর্ণ। জুতা নিয়ে একটি হিন্দি সুরেলা গান আমাদেরকে এখনও উতলা করে তোলে। গানের প্রথমটা হলো এরকম ঃ

মেরা জুতা হ্যায় জাপানী
মেরা মউত কি নিশানী
শর্পে লাল টুপি রূপপী ফিরবি
দিল হ্যায় হিন্দুস্তানী।

মুচীর অভিনয় করে (যেমন খুশী সাজো) অনেকবার অনেকেই প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। আমাদের গ্রামের সেই মহেন্দ্র চামার কবে মারা গেছে কিন্তু তাঁর ছবিটি আমার

মনের মুকুরে ভাসে। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে মহেন্দ্র জুতা মেরামত করতো। জুতা পরার আর কোন কায়দাই নেই আপনি সে জুতোটাকে কোন রকমে মহেন্দ্র'র কাছে দিতে পারলেই হয়। মহেন্দ্র সেটাকে গতিশীল করে ফেলেছে।

খুব পান খেত মহেন্দ্র। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল সে। কোনদিন তার কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা এবং অযোগ্যতা লক্ষ্য করিনি। জুতা নির্মাণের ব্যাপারে মহেন্দ্র ছিল এক্সপার্ট।

জুতা নিয়ে সাম্প্রতিককালে দু'টি ঘটনা আমাদেরকে যুগপৎ বিস্মিত করেছে। একটি ঢাকা টেলিভিশনের ঘটনা অন্যটি আন্তর্জাতিক। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ জুতা বিষয়ক একটি ঘটনা ঘটেছে টিভি ভবনে। সম্প্রতি এ ঘটনা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কারের কাহিনীর সাথে কোন মিল নেই। তবে ঘটনাটি বেশ মজার বলে কয়েকজন টিভি কর্মী সূত্রে জানা গেছে। 'শিল্পায়নে বাংলাদেশ' একটি পাক্ষিক কর্মকাণ্ড প্রচারমূলক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সম্প্রতি বাংলাদেশে জুতা তৈরী শিল্প সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদর্শনের জন্য এলিফ্যান্ট রোডের একটি জুতার দোকান থেকে অনুষ্ঠান সংগঠকরা কয়েক জোড়া জুতা নিয়ে যান। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে জুতা ফেরৎ দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে টিভি ভবনে এ জুতার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে এক হাস্যকর ঘটনার কথা জানা গেছে। অনুষ্ঠান ধারণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রযোজক এবং উপস্থাপক নাকি জুতোগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে বাসায় নিয়ে যান। অনুষ্ঠান প্রযোজনার সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মীরা কোন জুতা ভাগে পাননি। এ জন্যে তাদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। প্রোডাকশনের কয়েকজন কর্মীকে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে অনুযোগ করতেও দেখা গেছে।

জাতীয় প্রচার মাধ্যমের একজন প্রযোজকের এমন আচরণ টিভির অন্যান্য প্রযোজক ও কর্মকর্তাদের অবাক করেছে।

সম্প্রতি জাপানের একজন শিল্পী "Shoe's face" প্রদর্শনী করে আমাদেরকে হতবাক করে দিয়েছেন। টেলিভিশনের মিনি পর্দায় কয়েকদিন আগে তা প্রদর্শিত হয়েছে। চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

জুতা নিয়ে এবার একটি কৌতুক শুনুন। এক পাঠান চৌকিদার এক চোরকে ধরে নিয়ে থানার দিকে যাচ্ছেন।

চোর ঃ খান সাহেব আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

খান ঃ তুমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি। দারোগার সামনে চোর কাঁদতে লাগলো। তা দেখে খান সাহেব বললেন ঃ এই ব্যাটা লালঘর সামনে দেখে কাঁদছো?

চোর ঃ খান সাহেব আপনি আমাকে খালি পায়ে দারোগার সামনে নিয়ে যাচ্ছেন?

খান ঃ কি হয়েছে তুমার পায়ে?

চোর ঃ দৌড়াদৌড়ি করে যখন আমাকে ধরে আনেন তখন আমার জুতা কোথায় পড়ে গেছে। বড় সাহেবের সামনে এভাবে খালি পায়ে যাওয়া বেয়াদবি হবে।

খান সাহেব ঃ হ্যাঁ তাইতো। তু চোর জরুর হ্যায় লেকিন দিলকা বহুৎ সাচ্চা আদমি। ঠিক আছে আমি এখানে দাঁড়াবো তুমি জুতা নিয়ে আসো।

খান সাহেব কিছু সময় অপেক্ষা করার পর নিজের বোকামি বুঝতে পারলেন। খান

সাব এক সপ্তাহ পর আবার সেই চোরকে ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন। থানার সামনে আসতেই চোরটা আবার হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

খান সাব ঃ এই ব্যাটা, আজ তুমার কি নাই? জুতা, চপ্পল নাই?

চোর ঃ না খান সাব আজতো সব আছে। তবে আপনি যখন আমাকে মারধর করেন তখন আমার আড়াইশো টাকার কেমি ঘড়ির চেইন ছিড়ে কোথায় পড়ে গেছে।

খান সাব ঃ এসব আমি জানি না। ঐ দিন তুমি আমাকে বোকা বানিয়ে চলে গেছ। আজ তুমাকে ছাড়বো না।

চোর ঃ ঠিক আছে। আমি বড় সাহেবকে বলব ঘুষের উপর তুমি আমার ঘড়ি নিয়েছ।

খান সাব ঃ এই ব্যাটা চোর তুই আমাকে চোর বানাবি। ঠিক আছে আজ আমি তোকে ছাড়বো না। তুই এখানে দাঁড়া, আমি ঘড়ি নিয়ে আসবো। সবশেষে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের প্রবন্ধের ইতি টানব। শেখ মুজিবের আমলে ন্যায্যমূল্যের দোকানে চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে জুতা এসেছিল। সবাই লাইন করে দাঁড়িয়েছেন। বিরাট লাইন। কিন্তু জুতার স্টক সীমিত। লাইন এর শেষ লোকটি বললেন ঃ বোধহয় আজকে আমার কপালে আর জুতা নেই।

ছাগল সমাচার

প্রথমেই একটি জনপ্রিয় শ্লোকের কথা মনে পড়ছে। বাঘ ছাগলকে বলছে ঃ

"বর্ষাকাল এমন কালের কাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল
শুনরে ছাগল তোরে কই
সময় গনে সবই সই!"

বর্তমানে আমাদের চারপাশের জনপদে চতুষ্পদ ছাগলের সংখ্যা একদিকে কমছে বটে কিন্তু অন্যদিকে দ্বিপদ ছাগলের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। এই বেড়ে চলার ঘটনাটি আমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। আমরা তাই আতঙ্কিত।

এসব ছাগলের অভিভাবকরা কিন্তু একেবারেই নির্বিকার। এসব ছাগলেরা কি করে—কোথায় যায়—কি খায়—কাদের সংগে চলাফেরা করে—তাদের অভিভাবকরা কোন খবরই রাখেন না। কিন্তু কিছুসংখ্যক যুগ-সচেতন ও পরিবেশ-সচেতন নাগরিক ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা কম বেশী সবাই সমাজের কাছে কোন না কোনভাবে কিছু না কিছু দায়বদ্ধ। এসব দ্বিপদ ছাগলদের উৎপাত থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই-। আমরা তাদের সুচিকিৎসার জন্য আলাদা একটা হাসপাতাল চাই। বর্তমান সদাশয় সরকার এদিকে একটু নজর দেবেন কী?

এসব দ্বিপদ ছাগলেরা দিন দিন সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এরা কখনও হাইজাকার, কখনও নারী পাচারকারী, কখনও বা মাদকাসক্ত, কখনও বা নকল

সাপ্লাইকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত। এদের অন্য নাম বখাটে বা বখে-যাওয়া পোলাপান। এদেরকে বাঁয়ে যেতে বললে ডানে যায়, সোজা যেতে বললে বাঁকা পথে চলে ; এদেরকে স্নেহ করে কথা বললে তাকে দুর্বলতা মনে করে, শাসনের সুরে কথা বললে তারা সেটাকে শত্রুতা মনে করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বললে সে সব ছাগলেরা ভাবে- লোকগুলো কি বোকা- নষ্ট সমাজের জন্য পচে-যাওয়া মানুষের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা কোন্ কাজে আসবে? ফ্রান্সের একজন চিন্তাবিদ বলেছেন ঃ "বর্তমান পৃথিবীটাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে; ডানটা ঠিক ডানে নেই বামটা ঠিক বামে নেই, মধ্যখানটাও ঠিক যেন মধ্যখানে নেই।"

এবার আসা যাক চতুষ্পদ ছাগলের কথায়। প্রাণী হিসেবে ছাগল অত্যন্ত নিরীহ। কিন্তু বণ্য ছাগল ভয়ঙ্কর। তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করলে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। পাহাড়ী ছাগলকে জব্দ করার জন্য সামরিক বাহিনীও তলব করতে হয়। বেশ কিছুদিন আগে কিছু পাহাড়ী ছাগল বিদেশে হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছিল। বোকামীর দিক দিয়ে ছাগলের স্থান শীর্ষে। প্রকৃতিগতভাবে ছাগল খুব গোঁয়ার। মনুষ্য সমাজেও এক ধরনের মানুষ আছে ছাগলের মতই বুদ্ধিহীন ও গোঁয়ার। এরা প্রতিদিন ছাগলের মতই বুদ্ধিমান লোকদের কাছে ঠকে। পরে অবশ্য শিক্ষা লাভ করে কিন্তু সে শিক্ষায় কোন লাভ হয় না।

ছাগলকে নিয়ে আমরা যতই হাসি-ঠাট্টা করি না কেন ছাগলের চাষ করা সত্যি খুব দুরূহ ব্যাপার। তবে ঠিকঠাক মত চাষ-বাস করতে পারলে ছাগল আমাদের জন্য খুবই উপকারী। অর্থনীতিতে ছাগলের ভূমিকা সত্যি অনস্বীকার্য। একজন নিঃস্ব লোককে ছাগল বিত্তশালী বানাতে পারে। ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিতে পারে ছাগল। তাই ছাগলকে সব সময় ছাগল বলে উপেক্ষা বা অনাদর করা ঠিক নয়। ছাগল গৃহপালিত জন্তু। ছাগলের গোশ্ত পুষ্টিকর, উপাদেয় খাদ্য। ছাগলের দুধ অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ। ছাগলের 'স্টুল' সার হিসাবে উন্নতমানের। মূত্র দুর্গন্ধযুক্ত হলেও অনেক রকম রোগ জীবাণু ধ্বংস করে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছাগলের চামড়া, হাড়ডি, শিং থেকে নানা রকম বিলাসদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করা হয়- যা মানবকল্যাণে প্রভূত পরিমাণে সহায়ক। কাজেই সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায় ঃ

ছাগল বলিয়া করিওনা হেলা
আমি যা-তা ছাগল নই গো।

(প্রকৃত প্রবাদটি এ রকম ঃ 'বাঙ্গাল বলিয়া করিওনা হেলা আমি ঢাকার বাঙ্গাল নহি গো।')

বর্তমানে দেশে প্রচণ্ডভাবে খাদ্য ঘাটতি চলছে। বিদেশের দিকে আমাদের হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয়। আমাদের এখন থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে হাঁস-মুরগী চাষের সংগে ছাগল-চাষের পদ্ধতিকে-ও গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে ব্যাপকহারে। যেন ছাগলের চামড়া দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য বানিয়ে আমাদের দেশ প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। একজন ব্যক্তির হয়তো জায়গা আছে টাকা নেই, আবার একজনের হয়তো টাকা আছে জায়গা নেই, বুদ্ধিও নেই। এসব ক্ষেত্রে

সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে। আপনারা সবাই জানেন, আমাদের দেশে প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি আছে। তারা কি করেন? তারা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে সাইন পেন দিয়ে কোন্ কোন্ কাগজে সই করেন—এটা এদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ তা জানতে চান। এ দেশের মাটি সোনার চেয়ে-ও খাঁটি। সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে পারলে যে কোন মানুষ সোনা ফলাতে পারে।

আমাদের সবকিছু থেকেও কিছুই নেই। আমাদের হাত আছে, আমাদের শক্তি আছে। আমাদের অভাব কেবল মগজের। এদিক থেকে ছাগলের সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু পরিকল্পনাবিদদের মিল আছে। পূর্বেই বলেছি ছাগল আগাগোড়াই অসম্ভব মূর্খ এবং অসম্ভব জেদী। আমাদের কিছু পরিকল্পনাবিদও এক ধরনের জেদী এবং গোঁয়ার।

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মোরগের লড়াই, ষাঁড়ের, মহিষের লড়াই দেখার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়। এবং সে সব খেলা খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠে। বিশেষ করে পাঁঠার লড়াই তো দারুণ জমে উঠে শীতের মৌসুমে। গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসব খেলাই বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম।

একবার কোন এক বিচারসভায় জনৈক ঠোঁট-কাটা লোক খুব বেশী কথাবলা আরম্ভ করলো। উক্ত সভার বিচারক সাহেব বললেন ঃ তুই ব্যাটা আস্ত একটা ছাগল। দেরী না করেই সেই ঠোঁট-কাটা লোকটি উত্তরে বলেছিল ঃ স্যার ছাগল আমি ঠিকই তবে এ দেশী না 'পাটনাইয়া'। সেদিন সভায় কোন লোক না হেসে পারেননি।

যাদের মগজ খালি, যাকে বলে বুদ্ধির ঢেঁকি তাদেরকে তো আমরা ছাগলই বলি আর পরিমাণ বেশী হলে বলি রাম ছাগল। পরিসংখ্যান নিলে আমাদের দেশে এরকম কয়েক কোটি দ্বিপদ ছাগল খুঁজে পাওয়া খুব একটা দুরূহ ব্যাপার না। যদি বিরক্ত না হন তা হলে এক জোড়া ছাগলের গল্প বলি। গল্পটা এরকম ঃ এক জোড়া দম্পতি গভীর অরণ্যে বাস করতো। সেই অরণ্যে বন্য প্রাণী ছাড়া আর কোন মনুষ্য বাস করতো না। স্বাভাবিক নিয়মেই সেই দম্পতির একটা বাচ্চা হলো। বাচ্চাও আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো। সেই বাচ্চাকে বাবা-মা ডাক শেখানোর জন্য তারা একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। পদ্ধতিটা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অভিনব। স্ত্রী স্বামীকে বাবা ডাকা শুরু করলো এবং স্বামী স্ত্রীকে মা ডাকা শুরু করলো (নাউজুবিল্লাহ)। শিশু তাই শুনে শুনে সে-ও বাবা-মা ডাক শিখে ফেলল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছাগল এবং পাঁঠা হিসেবে কি সেই অরণ্যে বসবাসরত দম্পতিকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়া যায় না? আসা করি বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী এ ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিবেন না। কৃপণদের মধ্যেও অনেক ছাগল আছে যারা গায়ের শার্ট ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখে এবং পায়ের জুতা হাতে করে ঘুরে বেড়ায়। আরেকজন ছাগল বলেছিল ঃ ২০ টাকা দামের জুতাকেও মানুষ জুতা বলবে আবার ৫০০ টাকার জুতাকেও মানুষ জুতাই বলবে। সুতরাং বেশী দামের জুতা পায়ে দিয়ে লাভটা কি? পৃথিবীতে কত রকমের ছাগল যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। একজন রসিক লোক তাই রগড় করে বলেছিল ঃ একখানি কলাই ক্ষেত বুনে কত রং এর ছাগল যে দেখলাম রে ভাই।

ছাগলের প্রিয় খাদ্য সবুজ পাতা, ঘাস, খড়, বিচালি, চাল, চালের খুদ, ডাল, ভূষি ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রামের বাড়ীতে আট-দশটা ছাগল পোষা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে ছাগল প্রায় ইঁদুরের সমকক্ষ। ছাগলের বাচ্চা যেদিন প্রসবিত হয় সেদিনই লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করে। আল্লাহ'র কি অসীম কুদরত। অথচ মানুষের বাচ্চা? কতদীর্ঘ সময় পরে সে বাচ্চা হাঁটতে পারে। হাঁটার আগে কতবার যে আছাড় খায় তা শুমার করার উপায় নেই। ভাবতে খুব অবাক লাগে না?

অবাক লাগে আরো—আমাদের তৃণভূমি বনাঞ্চল এর অভাব নেই। অভাব কেবল পরিকল্পনার। ঠিকমত পরিকল্পনা নিলেই আমাদের অসংখ্য বেকার শ্রেণী গ্রামে বসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করতে পারে। কেবল ছাগলই পারে তাদেরকে বেকারত্বের গ্লানি থেকে বাঁচাতে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ছাগল চাষের কথা কখনো সখনো যে প্রস্তাবিত হয় না তেমন নয় তবে সেটা পরিকল্পনা বিভাগের টেবিলেই সীমাবদ্ধ। পশুপালন বিভাগ? তারাও তো ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ। ইচ্ছে করলেই তো তারা একটা কিছু করতে পারেন না। বিশেষ করে যেখানে লাল ফিতার ব্যাপার-স্যাপার জড়িত। দীর্ঘসূত্রিতার রাজত্ব সেখানে কায়েম হবে এটাইতো স্বাভাবিক।

দু'একটা মজলিশি কথা বলাও দরকার। ধরা যাক ছাগলের তিনটা বাচ্চা। দু'বাচ্চা দুধ খায় একটা এমনিতেই লাফাতে থাকে। সে চিত্র চলচ্চিত্রের দৃশ্যের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। কথায় বলে ঃ ছাগলের বাচ্চাকে কোলে নিলেও ভ্যাঁ করে, আবার টেনে নিলেও ভ্যাঁ করে। এটাই ছাগলের স্বভাব? মানুষের মধ্যেও এ ধরনের কিছু জীব আছে। এদেরকে আদর করলেও বিপদ আবার শাসন করলেও বিপদ। এরা বিপজ্জনক আদুরে দুলালী যাকে বলা হয় ছা-গ-ল।

ছাগল আমাদের প্রভূত উপকার করে সন্দেহ নেই, তবে যখন-তখন ক্ষতিও করে। ছাগল যে গাছে মুখ দেয় সে গাছ চিরতরের জন্য মরে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন ঃ ছাগলের মুখের লালায় এক ধরনের বিষ আছে যেটা গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কাজেই ছাগলের এই অত্যাচার থেকে গাছকে রক্ষা করতে হলে ভালমত বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। তাই বলে ছাগলের ভয়ে গাছ রোপণ করা বন্ধ রাখা চলবে না। একই সংগে গাছ-ও বড় হবে ছাগলও বড় হবে। দরকার কেবল সজাগ থাকা।

সেই বিখ্যাত গানের লাইনটিতো অনেকেরই জানা আছে ঃ

মরি হায়রে হায় দুঃখে পরান জ্বলে
হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচ শিকার ছাগলে।'

নাটকের একটি সংলাপ মনে পড়লো। "পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়-' কিন্তু পাগলে সব কথা বললেও মিথ্যা কথা বলে না আর ছাগল সব কিছু খেলেও ঘুষ খায় না। কিন্তু বর্তমানে কি দেখছি? দেখছি দ্বিপদ ছাগলগুলো ঘুষ ছাড়া এক পা-ও নড়ে না।

হে প্রভূ এই দ্বিপদ ছাগলগুলোকে আস্তে আস্তে মানুষ বানিয়ে দাও।

গাধা কত প্রকার ও কি কি?

গাধা সাধারণত ঃ দু' প্রকার। দ্বিপদ গাধা ও চতুষ্পদ গাধা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চতুষ্পদ গাধাকে নিয়ে যত না বিব্রত হতে হয় তার চেয়ে বেশী বিব্রত হতে হয় দ্বিপদ গাধাকে নিয়ে। দৈনন্দিন আমাদের চারপাশে কত রং এর এবং কত রকমের যে গাধা আছে তার ইয়ত্তা নেই। এসব গাধাগুলো বাইরের জীবনে খুব প্রগতিশীল একেবারে জনগণ-মন-অধিনায়ক ভারত তথা পৃথিবীর অধঃপতিত জনগণের ভাগ্য বিধাতা। কিন্তু পারিবারিক জীবনে এরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরা বৃদ্ধ বাবাকে সম্বোধন করে 'বুড়া' (ওল্ড হ্যাগার্ড) আর মাকে সম্বোধন করে 'বুড়ি' (ইয়া আল্লাহ্ এমন কুপুত্র যেন পৃথিবীতে না আসে। কারণ কুপুত্র যমের তুল্য। নবীর দুশমন) এসব গাধী-গাধাদেরকে তাদের ছেলেমেয়েরা ডাকে ড্যাডি/পাপা/মাম্মি বলে। এরা অত্যাধুনিকতার নামে যথেচ্ছাচারিতা করে এবং বিদেশী সংস্কৃতি অবাধে আমদানী করে সরকারী লাইসেন্স ছাড়াই। এসব গাধাদেরকে বলা হয় তথাকথিত ভদ্রলোক। সমাজের চিহ্নিত 'ইডিয়ট'। আমি বলি এরা চকচকে পোশাক পরিহিত সুন্দর গাধা। এসব গাধাদের কানের আকৃতি মৌলিক গাধাদের মত বড় নয়। ছোট। এদেরকে আমরা আদর করে গাধুও বলতে পারি।

আমার জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধু মাকসুদ হোসেন (আলমগীর) রসিকতা করে বলেন ঃ এক শ্যালক নাকি সাতগাধার কাজ করে। কথাটি আরো প্রাঞ্জল করে অলঙ্কার দিয়ে বললে বলতে হয়- এক শ্যালক মানেই হলো-রজত গৃহের সাতটি ভারবাহী চতুষ্পদ প্রাণী বিশেষ। তাই আপনি যদি দুলাভাই হিসেবে শালাকে দিনে রেগে কিম্বা আদর করে (যেভাবে আপনার ইচ্ছে) বলেন ঃ এই শালা গাধা এটা কি এনেছিস? চোখে দেখতে পাওনা শালা? অথবা যদি বলেনা ছাগল? শালা বাবু বলির পাঁঠার মত হাসিমুখে নীরবে এই মধুর গালি টুকু হজম করেন/করবেন। হজম করতেই হবে। কারণ বোনটা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে একটি নির্দিষ্ট দেনমোহরের বদৌলতে। বোন থাকলে কতবার যে শালা ডাক শুনতে হয়?

অন্যদিকে প্রচুর সুযোগ সুবিধাও আছে। যেমন মনে করেন আপনার দুলাভাই নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা। যদিও নবাব সিরাজের সেই ছোট ছাগলটি নবাব নয় সেটা স্রেফ ছাগলই। ধরা যাক দুলাভাই আর শালা একত্রে খেতে বসেছে। গিন্নী মাছের মাথাটা কৌতূহলবশতঃ স্বামীর থালায় প্লেস করেছে। তখন স্বামী বেচারীর অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন। তখন দুলাভাই নিজে এই লোভনীয় দ্রব্যটি না খেয়ে শালার পাতেই তুলে দেন। মাছের মাথার স্বাদ, দুলাভাই এর উচ্চারিত লক্ষ গাধার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

সহৃদয় পাঠক আমার অসংলগ্ন বক্তব্যের জন্য আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। গাধার ইতিহাস লিখতে গিয়ে শালার ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করেছি। অভিযোগ সত্য তবে ফরিয়াদীর কিছু বক্তব্য বাকি আছে। আমরা অনেক সময় চাল কিনতে গিয়ে ডাল এর দরটাও জিজ্ঞেস করি এবং সুবিধা পেলে ডাল কিনেও ফেলি। এটা ক্রেতারও দোষ নয় ডালেরও দোষ নয়। প্রয়োজনের চাপে কিছু কিছু এদিক ওদিক করতে হয়। অর্থাৎ অভিনয় করতে হয়।

আমি মাঝে মাঝে কোন ব্যাপারে যখন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাই তখন অতীব দুঃখে স্ত্রীকে বলি (আর কাকে বলব?) পেয়েছো তো একটা আল্লাহ্‌র গাধা সুতরাং ইচ্ছা মত

বোঝা চাপাও।

Excuse me. জানেন তো গাধার বোঝা কম হলে কিন্তু গাধা ঠিক তালে হাঁটতে পারে না? সুতরাং বোঝার ব্যালান্স করার জন্য তার চার পায়ের ক্ষুরের নীচে চারটি 'চারি' (অর্থাৎ হাঁড়ির ভাঙা টুকরা) রাখতে হয়। গাধার বোঝার চাপে যদি ঐ চারিগুলো ভেঙে টুকরা হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে বোঝা ঠিক মতই হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা রেগে গেলেই ফস করে বলে ফেলি তুই আস্ত একটা গাধা অথবা আস্ত একটা ছাগল। আর রাগের স্কেল যদি উঁচুতে থাকে তাহলে বলি- তুই, তু-ই একটা আস্ত রাম গাধা অথবা রাম ছাগল তার মানে গাধাত্ব বা ছাগলত্বের পরিমাণ বেশী। পড়া না-পারা ছাত্রকে কতবার যে গাধা ডাক শুনতে হয় শিক্ষকের কাছে তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানে। বোকামী করে সারতে না পারলে বাবা-মা-ও ছেলেকে নির্দ্বিধায় গাধা বলে।

গুরুতর কোন অপরাধ অথবা বোকামী বা ভুলের জন্য উঁচু শ্রেণীর লোক নীচু শ্রেণীকে হরহামেশাই গাধা সম্বোধন করছেন। এসব দেখে শুনে মনে হয় চারদিকে শুধু গাধার জয়-জয়কার।

গাধা যেন সগৌরবে বলছে ঃ

আমি ছিলাম

আমি আছি

আমি থাকবো।

সম্প্রতি চীনের এক বর্ষীয়ান নেতা বলেছেন ঃ বিড়ালটা সাদা রং এর না কালো রং এর এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো বিড়ালটা ইঁদুর ধরতে পারে কি না। আমরা গাধার সম্পর্কেও এরকম একটা উক্তি করতে পারি ঃ গাধাটি বাদামী রং এর নাকি ছাই রং এর এটা বড় কথা নয় গাধাটি বোঝা টানতে পারে কি না সেটাই হলো আসল কথা।

গাধার আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে; সেটা হলো—গাধাকে বোঝা চাপালেও যেমন হাঁটবে, বোঝা না চাপালেও সে একই রকম গতিতে হাঁটবে। কথাটা ঐ রকমেরই হলো- বকরীর বাচ্চাকে কোলে নিলেও ভ্যাঁ করবে আবার টেনে আনলেও ভ্যাঁ করবে।

বর্তমানে সভ্যতার জন্য যার মূল্য বেশী সে হলো- পেট্রোল। যেদিন পেট্রোল শেষ হবে সেদিন সভ্যতাও শেষ (তাই পেট্রোলকে বলা হয় তরল সোনা (লিকুইড গোল্ড) তার মানে সমস্ত যানবাহন বন্ধ। তখন কিন্তু অগতির গতি গাধাই আমাদের একমাত্র বাহন বলে বিবেচিত হবে। কাজেই গাধাকে যদি আমরা বলি সভ্যতার বাহন সেটা কি খুব অন্যায় হবে? আমরা যদি কাব্য করে বলি ঃ

গাধা সে যতই গাধা হোক
দেখেছি তার বহন করার ঝোঁক।

বর্তমান বিশ্বে গাধার প্রজাতি খুবই কমে আসছে। এ ব্যাপারে আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। কারণ প্রতিবাদ না করে গাধা কেবল মনুষ্য জাতির কল্যাণই করে যাচ্ছে। এই হচ্ছে গাধার পণ।

প্রাণী হিসেবে গাধা অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত ও সহিষ্ণু বটে। খাওয়ার ব্যাপারেও গাধা খুব একটা অভিজাত নয়। যেন তেন শুকনো খড় বিচালি দিলেই গাধা খুশী। ডেলিশাস ফুডের

জন্য গাধার তেমন মাথা ব্যথা নেই বললেই চলে।

গাধার সাথে ছাগল এবং খারাপ ছাত্রের খুব মিল আছে। এই তিন প্রাণীর মধ্যে আরেকটি জিনিসের সামঞ্জস্য আছে গাধার কান বড়, ছাগলের কান বড় এবং খারাপ ছাত্রদের কানও বড় (কান টানতে টানতে বড় আকার ধারণ করে)। শিক্ষক বড়ই নিষ্ঠুর এবং রসিকও বটে। কানটা ধরেই বলেন ঃ গাধা কোথাকার! পড়া না শিখেই ক্লাসে আসলে এই অবস্থাই হয়। গাধা ডাকটা শুনতে যতই শ্রুতিকটূ হোক না কেন বলতে আমাদের ভালই লাগে।

কথিত আছে বাপের বড় ছেলেরা সাধারণতঃ বড় গাধা হিসেবেই পরিচিত থাকে। বড় গাছে যেমন বড় ঝড় লাগে বাড়ীর বড় ছেলেকেও সেই বড় ঝড়ের ধাক্কা সহ্য করতে হয় নীরবে এবং বিনা প্রতিবাদে। রাজনৈতিক অঙ্গনে গাধা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের মুখে ফিরবে। যেমন মীর জাফরকে বলা হয় ক্লাইভের গাধা, আ. স. ম. আব্দুর রবকে বলা হয় স্বৈরাচারী এরশাদের গাধা (কেউ কেউ আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন এরশাদের পা-চাটা কুকুর)। কৃষণ চন্দ্রর লিখিত "আমি গাধা বলছি" এবং "নেহেরুর সঙ্গে গাধার সাক্ষাৎকার" অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। যাঁরা পড়েননি তাঁরা পড়ে নেবেন।

কিছুদিন আগে মাহবুব তালুকদার একটি নাটক লিখেছিলেন "গাধা"। সে নাটকটি টিভির পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছিল।

গাধাকে নিয়ে আমরা যতই ঠাট্টা মস্করা করি না কেন- গাধার উপকারিতা অপরিসীম। গাধার বিশ্বস্ততাও মনে রাখার মতো। গাধার ধৈর্যশক্তিও অপরিসীম। গাধার কাছ থেকে ধৈর্যের ব্যাপারে অনেক কিছু শেখার আছে এবং শেখাবার আছে। আল্লাহ যদি ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন তাহলে গাধার সঙ্গেও আছেন।

গাধা প্রাণী হিসেবেও নিরীহ ভারবাহী, বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী, নিরলস, প্রতিবাদহীন ও অল্পতেই খুশী। গাধার কণ্ঠস্বর বিশ্রী তাই সে ডাকাডাকিও করে কম।

খোদা না করুক হয়তো অকস্মাৎ দেখা গেলো সারা পৃথিবীব্যাপী তেলের অভাব তখন মানুষ মালামাল কিভাবে স্থানান্তর করবে? তখন নিরীহ প্রাণী গাধাই দাঁড়াবে মানুষের অতি কাছে।

গাধা ও ঘোড়ার (স্ত্রী ও পুরুষ) সংমিশ্রণের ফলে যে বাচ্চা পয়দা হয় তার নাম খচ্চর। তবে প্রাণীটি আস্তে আস্তে বিরল হয়ে যাচ্ছে। আমরা ব্যবহারিক জীবনে কারো উপর খুব বেশী রেগে গেলে তাকে খচ্চর বলে গালি দিতেও কসুর করি না। আমাদের সমাজ জীবনে গাধার ভূমিকা সর্বত্র বিরাজমান। সেই সংগে খচ্চরও আছে। গ্লাস ভাঙার পর রাগ যেমন পড়ে যায় খচ্চর বলার পরও রাগ কমে যায়।

গাধার প্রজাতি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের হুমকিস্বরূপ। গাধার সংখ্যাকে বাড়াতে হবে। কারণ এসব প্রাণী প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

গাধার ভূমিকা সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে আছে। গাধার দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা অনেককে চপেটাঘাত করতে পারি কৌশলে। একটা চুটকি শুনুন ঃ গাধারা দুই বন্ধু। একটা সার্কাসের গাধা অন্যটা ধোপার গাধা। হঠাৎ পথিমধ্যে ওদের দেখা হয়ে গেল। একজন আরেকজনকে বলল ঃ কেমন আছো দোস্তো?

ধোপার গাধা বলল ঃ আছি ভাই একরকম। গাধার আবার একটা জীবন হলো?

মালিকের হুকুম তামিল করি আর দিন যাপন করি। তুমি এখন কেমন আছো দোস্তো? বিয়ে শাদী? সার্কাসের গাধা বলল ঃ সার্কাসের গাধার চার্ম আছে দোস্তো। সন্ধ্যা হলেই আলো ঝলমল করে উঠে আর আমিও আন্দোলিত হই। তবে দোস্তো ভবিষ্যতের একটা উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছি। স্বপ্নটা হলো ঃ সার্কাসের ম্যানেজারের মেয়েটা পড়া না পারলে তার 'টিচার' বলেনঃ 'দ্যাখ ফাল্গুনী! পড়াশুনা না করলে, সার্কাসের ঐ গাধাটার সাথে তোর বিয়ে দিয়ে দিবো।' আমি সেই ভরসায় এই সার্কাস পার্টিতে চাকরি করছি।

গাধাকে নিয়ে আরেকটি চুটকি শুনুন ঃ কথিত আছে গাধারা তিনবার হাসে। ধরা যাক একটা অনুষ্ঠানে সবাই হাসাহাসি করছে। সবার দেখা দেখি গাধাও হাসে। পরক্ষণে গাধা ভাবে কেন হাসলাম? তারপর ঘটনাটা তার সম্মুখে খোলসা হয় কি জন্য সে হাসলো মানে আগে মানুষগুলো কি কারণে হাসছে তা বুঝতে পারে। যেই বুঝতে পারে অমনি আর একবার হাসে। এটা তার দ্বিতীয়বার হাসা। পরবর্তীতে গাধা ভাবে প্রথমবার সে না বুঝে হেসেছে তাই মনে মনে ভাবে আসলেই সে গাধা। নিজেকে যেই গাধাভাবে অমনি আরেকবার হাসে। এটা তার শেষ এবং তৃতীয়বার হাসা। আজকের নিবন্ধটি এ্যালবার্ট লীর গল্পটা দিয়েই ইতি টানবো ঃ

সরকারী চাকুরীতে গাধা

গল্পটা বলেছিলেন এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন স্বয়ং। ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডের আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মী দিনের আবহাওয়ার যে পূর্বাভাস ঘোষণা করতেন তা কোনদিনই মিলতো না। বিশেষ করে যেদিন তিনি বলতেন বৃষ্টি হবে, সেদিন আকাশে মেঘের চিহ্নও দেখা যেতো না, আর যেদিন ঘোষণা করতেন আজ বৃষ্টি হবে না সেদিন বৃষ্টি হতো মুষলধারে। স্থানীয় এক বালক বলল ঃ "আমি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস বলে দিতে পারি।" পরীক্ষা করে দেখা গেল ছেলেটিই বৃষ্টির কথা আগে থেকেই জানিয়ে দিতে পারে। কর্তৃপক্ষ ছেলেটিকে ডাকলেন আবহাওয়া অফিসে কাজ করার জন্য। "কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছু জানি না। আমার পোষা গাধাটি আবহাওয়ার কথাটা বলতে পারে নির্ভুলভাবে। ঝড়-বৃষ্টি আসার আগে গাধাটা বেড়ায় কান ঘসে আর ক্রমাগত ডাক্‌তে থাকে" বলল ছেলেটি।

অতএব, শহরের মেয়র কাজটা দিলেন ঐ গাধাটিকেই—আর সেটাই হলো মস্ত বড় ভুল। কেন? কারণ তারপর থেকে সরকারী চাকুরীতে শুধুমাত্র গাধারাই কাজ করতে চাইছে, আর পাচ্ছেও।

'রেয়ার কালেকশন'

বিশাল ঢাকা শহরে 'সুচিত্রা' অফিস প্রাঙ্গণটি আমার কাছে মরূদ্যানের মতই শান্তি-দায়ক। আর এর প্রধান আকর্ষণ মিঃ খালিদ মাহমুদ ও নূর হোসেন। তাঁরা দুজনই রসের ভাণ্ডার। সারাক্ষণ অফিসটাকে রং তামাশায় মাতিয়ে রাখেন। বক্তব্য আদিরসের

আধিক্যই পরিলক্ষিত হয় বেশী করে। তাঁদের রসের আসরে একদিন অংশ নিতে গিয়ে আমাকে এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ আমার বুক পকেটে একটি সুন্দর কলম ছিল। ওটা ছিল আমার রেয়ার কালেকশন। সাধারণতঃ ও ধরনের কলম আমি সাথে রাখি না। কারণ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী। খোয়া যেতে পারে, কেউ লিখতে নেওয়ার জন্য চাইতে পারে, অতি আপনজন একেবারেই নেবার দাবী জানাতে পারে, এরকম আরো অনেক কারণ থাকতে পারে বলেই আমি 'রেয়ার কালেকশন' এর দ্রব্য সাথে রাখি না। তবে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার জন্য অনেক ইচ্ছাকেই দৈত্যের মত বোতলে পুরে রাখতে হয়। যাই হোক অনুজপ্রতিম নূর হোসেন আমার পকেট থেকে সেই সুন্দর বল পেনটি ছোঁ মেরে নিজের পকেটে রাখলো এবং বললো ঃ "আপনি তো কলমের সম্রাট এ রকম দু'একটা কলম ছোট ভাইদেরকে দিলে কী হয়?" আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। গেছেরে সব গেছে। আর বোধহয় কলমটা রাখতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, কিছু হয় না, কিন্তু এমন একটা কলম বেহাত হলে মানসিক রক্তক্ষরণ হয়।

নূর হোসেন কলমটি নিজের কাছে রেখেই বলল ঃ স্যার, কলমটা কি করব? আমি বললাম ঃ পকেটে রাখুন। কার পকেটে রাখতে হবে এটা বললাম না। সে তো খুশী হয়ে নিজের পকেটেই রাখলো। সংগে মিঃ মাহমুদও কিছুটা তাল দিয়ে বিষয়টিকে আরো উস্কে দিলেন। আমিও লজ্জায় সুস্পষ্ট করে কিছু বললাম না। ভাবলাম নুর হোসেন স্রেফ রসিকতার জন্যই আমার সংগে এমনটা করলো। নূর হোসেন কলমটা বগল দাবা করেই ভাগলো। আমিও কলম হারানোর জ্বালা নিয়ে মাহমুদ ভাই-এর অফিসকক্ষ ত্যাগ করলাম। দু'তিন দিন আর গেলাম না ওদিকে। ভাবলাম নূর হোসেন যদি কলমটা না দেয় তা হলে আমি ওকে আর কিছুই বলবো না। কিন্তু আবার মনে মনে ভাবলাম, কলমটা সে কোন্ যুক্তিতে নিজের কাছে রাখবে? আমার হিসেবে তো মিলে না। ব্যাপারটা এ রকম ঃ কইতেও পারি না সইতেও পারি না। কিন্তু ঢুকে যাওয়া কাঁটা তো সরাতে হবে। আমার জীবন পরিক্রমায় এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি কোনদিন হইনি। কিন্তু নূরা পাগলা আমাকে সেই অস্বস্তিকর অবস্থার মুখেই ঠেলে দিল।

চলার পথে কাউকে কিছু প্রেজেন্ট করা অথবা কারো কাছ থেকে কোন প্রেজেন্ট পাওয়া সত্যি আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু কেউ যদি অহেতুক জোর করে প্রেজেনটেশন দাবী করে বসেন তখন কিন্তু প্রেজেন্ট করার আনন্দ নিমেষেই কর্পুরের মতই উবে যায়। এখানে আমার বক্তব্য এটাই যে, কোন আপনজন যেন প্রেজেন্টদাতাকে কখনোই কোন অস্বস্তিকর বা বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলেন।

৬ মার্চ ৮৯ আমি মাহমুদ ভাই এর অফিসে গেলাম। মামুলী কুশলাদিও বিনিময় হলো। এক প্রসংগে সেই রেয়ার কালেকশন এর কথাটিও উত্থাপিত হলো।

সুপ্রিয় মাহমুদ সাহেব আমার কলমটি নিজের ড্রয়ারে সযত্নে রেখে দিয়েছেন বলে জানালেন। আমার নিজের কানকে সে মুহূর্তে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কলমটা আবার ফেরৎ পাবো এ আশা বিন্দুমাত্রও ছিল না। তবে কলমটা ফেরৎ পেলে খুশী হতাম! এ রকম একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলাম- এটা সত্য। হায়রে কুকিনী আশা!

কোন কোন কট্টর সমালোচক এই সামান্য ব্যাপারটির পেছনে এতো কথার অবতারণা

করাটা খুব একটা ভাল চোখে দেখবেন না। হয়তো বাড়াবাড়ি ভাববেন। তার উত্তরে বলব ঃ কোন ছোট বিষয়কেই ছোট মনে করা উচিত নয়। বিষয়টি আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা ছোট বা তুচ্ছ বা কিচ্ছু না, সেটাই আরেকজনের কাছে বড়, অনেক বড় এবং অনেক কিছু এমনকি অনেক সাধনার ধন। দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি। একজন নোবেল লরেটের ছোট একটা চিঠি মুদিখানার দোকানদারের কাছে ঠোঙ্গা বানানোর কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু একজন সংগ্রাহকের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। এই কথাটা বুঝানোর জন্যই আমাকে এত কিছু বলতে হচ্ছে। কবি বলেছেন ঃ "আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই, কাব্যের জাল বুনি।"

এবার সেই আসল কথাটাতেই আসি। সুপ্রিয় মাহমুদ ভাই আমাকে সেই রেয়ার কালেকশনটি ফেরৎ দিয়েছেন ৬ মার্চ তারিখে। মাহমুদ ভাই একজন চৌকস প্রকৌশলী, যাকে আমরা কখনো কখনো ঠাট্টা করে বলি ছুতার মিস্ত্রি। কিন্তু কলমটি ফেরৎ দেবার সময় আমার মনে হলো তিনি একজন জাঁদরেল মনস্তত্ত্ববিদ। শুধু তাই নয়, আমার মনে হলো 'হি ইজ রিয়ালি গ্রেট।' অনেক টাকা দিয়ে অনেক জিনিস কেনা যায়, কিন্তু অনেক টাকার বিনিময়ে অনেক সখের জিনিস বা কাংক্ষিত জিনিস কেনা যায় না অথবা পাওয়াও যায় না। এই ছোট্ট একটা কথা বলার জন্য আমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে এতগুলো কথা বলতে হলো।

পাঠকের প্রত্যাশা

"গায়কের একা নহেত গান
গাইতে হবে দু'জনে।"

বলেছেন কবিগুরু রীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গায়ক এর সামনে যখন শ্রোতা মনপ্রাণ দিয়ে গান শোনেন তখনই গায়কের আনন্দ। আর এখানেই গায়কের সাফল্য এবং সার্থকতা। তবে মাঝখানে আরেকটি কথা এসে যায় তা হলো—সমঝদার শ্রোতা বা শ্রোতামণ্ডলী। রূপবান গানের আসরে অনেক শ্রোতার আমদানী হয়, তাই বলে আমরা তাকে উঁচু স্তরের গান বলব না। অনুরূপভাবে উচ্চাঙ্গ এর গান এর আসরে শ্রোতা কম হয় বলে তাকে আমরা নীচু স্তরের গান বলতে পারি না। এখানে মান-মর্যাদার ব্যাপার আছে।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে হয়। পানির সাথে যেমন ঢেউ-এর অবিচ্ছদ্য সম্পর্ক, তলোয়ারের সাথে যেমন খাপের সম্পর্ক, ঘোড়ার সাথে যেমন সহিসের, তবলার সাথে যেমন চৌকস আঙ্গুলের, আঙ্গুলের সাথে যেমন নখের, চোয়ালের সাথে দাঁতের, জিহ্বার সাথে যেমন স্বাদের, কাঁচের সাথে পারার, মাংসের সাথে চামড়ার, 'হেড' এর সাথে 'হার্ট' এর, মাছের সাথে পানির, এভাবে সমস্ত শরীরের বিভিন্ন ছোটখাটো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বা সম্পর্কিত, সেভাবে সীমিত লেখকের সাথে অসংখ্য পাঠকের সম্পর্কও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লেখক লেখেন মনের মাধুরী মিশিয়ে আর পাঠক পড়েন আনন্দ সহকারে। এই গোপন মধুমেলায় লেখক এবং পাঠক পরস্পরের সাথে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে মিশে যেতে হবে। তাহলেই খেলা জমবে। লেখককে আমরা

বিক্রেতা হিসেবে মনে করতে পারি। কথা উঠতে পারে কি রকম বিক্রেতা? হ্যাঁ সে বিক্রেতা মদের-ও হতে পারে দুধের-ও হতে পারে। লেখক হলেই যে তিনি সুলেখক বা সুসাহিত্যিক হবেন এমন কথা হলপ করে বলা যায় না বা বলা-ও ঠিক নয়। অনেক লেখক কুলেখকও হতে পারেন। তিনি লেখার মাধ্যমে তস্করবৃত্তিও বেছে নিতে পারেন। হ্যাঁ, তার লেখারও অনেক পাঠক পাওয়া যেতে পারে। এমন কি কালের বিচারে দেশের সরকার দেশের মঙ্গলার্থে সে লেখা বাজেয়াপ্ত-ও করতে পারেন।

তবে একজন সুস্থ্য ও সচেতন পাঠক হিসেবে লেখকের কাছে আমার প্রত্যাশা ঃ আমি লেখা পড়ে নির্মল আনন্দ পেতে চাই, যে আনন্দ আমার বিক্ষুব্ধ আত্মাকে বিশুদ্ধ করবে ; সেই লেখা আমার বার বার পড়তে ইচ্ছা করবে এবং অন্যান্যদেরকে পড়াতে ইচ্ছা করবে। মন গুন গুন করে গানের সুরে বলবে ঃ 'যে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে, সবখানে .... সবখানে।'

আমি নিশ্চিত, আমরা যদি লেখকের লেখা পড়ি এবং আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি তা হলে লেখক অবশ্য লিখতে পারবেন এবং লেখার মান উত্তরোত্তর বাড়বে। কারণ লেখার ভোক্তা তো আমরাই, মানে পাঠকেরা। লেখক যদি হরদম লিখতে পারেন আমরা তা হরদম পড়তে পারব না কেন? আমরা কি দুর্বল বা কমজোর পাঠক? লিখতে যেমন কৌশল লাগে, পরিশ্রম লাগে, অনেক তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করতে হয় ঠিক তেমনিভাবে পাঠককে-ও মনে রাখার জন্য অনেক কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, মনোযোগী হতে হয়। অর্থাৎ পাঠক হতে হলে কঠিন পরিশ্রমী হতে হয়। এখানে আমি সাধারণ পাঠকের কথা বলতে চাই না, আমি বলতে চাই—'পাঁড় পাঠকের কথা' (ডঃ মুজতবা আলীর ভাষায়)। আর কে না জানে যে কঠিন পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। তাই লেখকের সংগে পাঠককেও পরিশ্রমী হতে হবে। আমরা কবি জীবনানন্দ এর ভাষায় বলতে পারি ঃ 'সকলেই লেখক নয় কেউ কেউ লেখক।' একই সুরে বলতে পারি ঃ 'সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক।' সমালোচকের বেলায়ও ঐ একই কথা প্রয়োগ করতে পারি।

লেখক যদি গোঁয়ার্তুমি করে বলেন ঃ পাঠক আবার কে? পাঠককে আমি থোড়াই কেয়ার করি। পাঠক হিসেবে আমরা তা বলব না। এ ব্যাপারে আমরা অনেক উদার ও সহানুভূতিশীল। আমরা সহানুভূতির সাথে বলব ঃ পড়েই দেখি না কেন লেখক কি বলতে চান? লেখক তো এই সমাজেরই একজন অভিজ্ঞ এবং পোড়-খাওয়া মানুষ। নিশ্চয় তিনি আমাদের কথাই বলবেন। তিনি তো পাহাড়ে কিম্বা নির্জন বনভূমিতে একাই বাস করেন না? পাঠক হিসেবে একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে পারি ঃ 'এই সমাজে বাস করে যিনি সমাজের মঙ্গল চিন্তা না করে কেবল নিজের কথাই ভাবেন, তাঁর সাথে এবং একটা শূকর ছানার সাথে কোনই প্রভেদ নেই।' সমাজের শুভ চিন্তাগুলো এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আর প্রকাশিত হয়েছে বলেই আমরা সেগুলো জানতে সক্ষম হয়েছি। লেখক বা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যদি ঐসব মূল্যবান বক্তব্য বালিশের নীচে অথবা স্টীলের বাক্সে বন্দী করে রেখে দিতেন তা হলে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। লেখক এ কারণেই আমাদের মত পাঠকের কাছে শ্রদ্ধাভাজন ও স্মরণীয়-বরণীয়, পূজনীয় তো বটেই। লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পাঠকের চেয়ে অনেক-অনেকগুণ বেশী। সে সমস্ত কারণেই তাঁরা লেখক হতে পেরেছেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে অনেক চিন্তাশীল পাঠকের

বিশ্লেষণ-ক্ষমতাও খুব একটা কম নয়। তাই পাঠককে কোনক্রমেই অবহেলা করা যাবে না।

লেখকের বুকের মধ্যে আছে একটি শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক মুভি ক্যামেরা। এই ক্যামেরা দিয়ে লেখক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যখন-তখন সাধারণ একটি ছবিকে অসাধারণ ছবি হিসেবে দর্শক তথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন। আর লেখকের কৃতিত্বে এখানেই। প্রকৃতি প্রেমিক ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ড্যাফোডিলস্' কবিতায় বলেছেন ঃ 'আই গেজড এন্ড গেজড বাট লিটল থট।' ক্ষুদ্র জিনিষের মধ্যে যিনি বৃহৎ ছবি আঁকতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে বড় মাপের কবি। পাঠক তাঁকে অবশ্যই সাদরে গ্রহণ করবেন এবং উষ্ণ অভিনন্দন জানাবেন।

আমরা জনৈক কবি বন্ধু কে, এম, সালাহউদ্দীন একবার কথা প্রসংগে বলেছিলেন ঃ সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরায় যে কোন ছবি তোলা হয় না। কারণ সেটা খুবই দামী ক্যামেরা। সুতরাং দামী ক্যামেরায় দামী ছবি তোলা হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। একজন রিপোর্টারের উক্তি ঃ তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। অন্য আরেক রিপোর্টারের উক্তি ঃ 'হি ওয়াজ নট এ হিরো বাট এ হিরো মেকার।'

একজন সম্পাদক এবং বাড়ীওয়ালার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। বাড়ীওয়ালার টাকা আছে তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন রকম ডিজাইনের বাড়ী বানাতে পারেন। ইচ্ছা করলে তিনি সে বাড়ীটাকে পাটের গুদাম কিম্বা আলু সংরক্ষণের জন্য কোল্ড স্টোরেজও বানাতে পারেন। এ জন্য তাঁকে কোন কৈফিয়ৎ-ও দিতে হবে না। কিন্তু একজন সম্পাদক যদি পত্রিকা বের করেন তাঁকে সর্বাগ্রে অগণিত পাঠকের কথাটাই ভাবতে হবে। পাঠকের ক্ষুধার কথা সম্পাদককে ভাবতে হবে। কি কি খাবার খাওয়ালে পাঠক সন্তুষ্ট হবেন এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নতি হবে। এখানে তো পর্ণ ম্যাগাজিন-এ বাজার সয়লাব! এটা কি সুস্থ সমাজের পরিচয়? এসব ম্যাগাজিনের মাননীয় সম্পাদকদেরকে কি আখ্যা দেয়া যায় আপনারাই বলুন? এ ব্যাপারে আমি অগণিত সচেতন পাঠকবৃন্দের কাছে একটি ছোট্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাখলাম।

একজন সম্পাদক আমার কাছে বৃহৎ টাইটানিক জাহাজের অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন। তিনি তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও নীতিমালার সাহায্যে জাহাজটি পরিচালনা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবেন। একজন যাত্রী হিসবে সবাই ক্যাপ্টেন এর কাছে এটাই আশা করবেন। রাষ্ট্রনায়কের কাছে, নাগরিক আশা করবেন দেশটাকে তিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচলানা করবেন এবং প্রত্যেকটি নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করবেন। বিদ্যালয়, মহা বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদের কাছে ছাত্র তথা অভিভাবকদের প্রত্যাশা তাঁরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট থেকে ছাত্রদেরকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। এ ব্যাপারে সফলতা এলে তিনি বা তাঁরা নন্দিত হবেন ব্যর্থতা এলে তিনি বা তাঁরা নিন্দিত হবেন এই প্রশংসা বা নিন্দার হাত থেকে কেউ রেহাই পাবেন না।

সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রধানদের কাছে আমার আবেদন ঃ আপনারা যে যে-অবস্থানে আছেন—আপনারা ভাল কাজ করুন আমরা আপনাদেরকে নির্বাচিত করব, অন্যথায় আপনাদেরকে আমরা 'বয়কট' করবো। স্মরণ রাখা উচিত ঃ ব্যাষ্টি কিছুই নয় যদি তার পেছনে সমষ্টির সমর্থন না থাকে। বাংলায় প্রবাদ আছে ঃ একা না বোকা। বিজ্ঞ প্রধান ভাইয়েরা নিজেদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে সবার কথা ভাবুন তাতে আপনাদেরকে আমরা মাথার

মনি করে রাখবো। কিন্তু সাপের মাথার মনি হবেন না। সেটা ভয়ংকর। হাসপাতালের সর্বস্তরের ডাক্তার ও নার্সদের কাছে আমার প্রত্যাশা, আপনারা রোগীদের আরোগ্যলাভের আগে অন্য কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে নিজেদের রোগ আছে কি না এটা পরীক্ষা করিয়ে নিন। ডাক্তারদের জন্য স্মর্তব্য ঃ "Doctors heal thyself (ডক্টরস হীল দাইসেল্ফ।" অর্থাৎ ডাক্তার আগে নিজে সুস্থ হও) থানা প্রধান, যাকে অপরাধী ভেবে আটকাদেশ দিয়েছেন তিনি নিজে কতটুকু অপরাধী আগে তাকে সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে হবে (এখানেও উপরোক্ত প্রবাদবাক্যই প্রযোজ্য। যে কোন বিদ্যা নিকেতনের যে কোন শিক্ষকের মনে রাখা দরকার তারা ছাত্রদেরকে আজকের দিন কি পড়াবেন? তিনি বা তাঁরা সেই স্ব স্ব বিষয় সম্পর্কে সত্যি সত্যি নির্ভুল শিক্ষা দিতে পারবেন কি? নাকি গয়রহ ভুল শেখাবেন? মনে রাখা উচিতঃ ভুল শেখানোর চেয়ে না শেখানো অনেক ভালো। কারণ একটা ভুল আরেকটা ভুলের জন্ম দেয়। আবার এটার উল্টোটাও সত্য। একটা সঠিক জিনিষ আরেকটি সঠিক জিনিষের সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু অন্ধকার সঠিক পথের সন্ধান দিতে অক্ষম। সঠিক পথের নিশানা দেবেন আলোকবাহী শিক্ষকবৃন্দ। কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষককে সচেতন হতেই হবে। কথায় বলে ঃ 'এডুকেশন ইজ দি ব্যাকবোন অফ এ নেশান' অর্থাৎ শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে সেই মেরুদণ্ড আজ ঘুণ-ধরা আর ক্যান্সারে আক্রান্ত। সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার নামে চলছে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, রাজনীতির নামে চলছে ভণ্ডামি, ধর্মের নামে চলছে অধর্ম, দেশ প্রেম এর নামে চলছে গাদ্দারি, অর্থাৎ যা কিছুই ঘটছে গায়ের জোরে ঘটছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্ত থাকতে পারে না। আমরা আর 'সিস্টেম লস' এর শিকার হতে চাই। আমরা চাই সিস্টেম বদলাতে। মূলকথা একটাই একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র চাই।

সম্পাদক মহোদয়ের কাছে প্রত্যাশা ঃ আপনার পত্রিকার মাধ্যমে দেশের ঘরে ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিন। যে আলোর সাহায্যে দেখতে পাবো ঘরের কোন্ কোন্ কোণে দুধ আছে আর কোন্ কোণায় সাপের গর্ত আছে। যুগ যুগ ধরে আমরা আর দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষতে চাই না। সাপ দেখলে ঘেন্না লাগে, ভয়-ও লাগে যেমন ছিনতাইকারী দেখলে ভয় লাগে, ঘেন্না-ও লাগে।

আমার শেষ শ্লোগান ঃ "সম্পাদক, তুমি এগিয়ে চলো, আমরা (মানে পাঠকবৃন্দ) আছি তোমার পিছে।"

প্রাত্যহিক জীবনে 'অতি' নামক একটি বিপজ্জনক শব্দ

অভিজ্ঞজনেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে মারাত্মক ও ভয়াবহ রোগ 'প্লেগ' এর সংগে তুলনা করেছেন। এই 'প্লেগ' নামক মহামারীর আমদানী করেন সমাজের কিছু অতি উৎসাহী লোক। এই অতি উৎসাহী লোকগুলো সমাজের সবচেয়ে বড় 'ব্যাড এলিমেন্ট'। এই ব্যাড

এলিমেন্টগুলো যতদিন থাকবে ততদিন সমাজের কোন মঙ্গল হবে না। কারণ ব্যাড এলিমেন্টগুলো নদীর শ্যাওলার মত। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে নদীতে শ্যাওলা বেশী সে নদীতে কখনো স্রোত থাকতে পারে না। কাজেই স্রোতহীন নদী আর আশীবিষে জর্জরিত অথবা উৎসাহহীন যুবক একই বন্ধনে বাঁধা এবং বাধাপ্রাপ্ত স্রোতহীন নদী যেমন প্রকৃতির কোন মঙ্গল ডেকে আনে না ঠিক তেমনি উৎসাহহীন যুবকও সমাজের কোন মঙ্গল ডেকে আনে না।

সাধারণের চেয়ে 'অতি সাধারণ' অথবা 'অতি অসাধারণ' দু'ধরনের ব্যক্তিই সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনে। বর্তমানের এই ক্রান্তিলগ্নে আমরা 'অতি' নামক অতিকায় হস্তিকে বর্জন করে সাধারণ একটি হালের গরু এবং সাধারণ একটি দুগ্ধবতী গাভী কামনা করি। যে গাভী আমাদেরকে দুধ দেবে। সেই দুধ পান করে শিশু-বৃদ্ধ-যুবক বাঁচবে। কারণ দুধ হচ্ছে আদর্শ খাদ্য। এতে ছয়টি খাদ্যপ্রাণ বিদ্যমান। এই মুহূর্তে আমাদের মত গরীব দেশে অতিরিক্ত কিছু একটা আশা না করে গণতন্ত্রের উন্নয়ন চর্চার সংগে সংগে গরু-গাভীর উন্নয়ন চর্চার দিকে মনোযোগী হই। আসুন আমরা পাল্লা দিয়ে ফলমূল ও ফুলের গাছ রোপণ করি। অক্সিজেনের বড়ই অভাব। যদি বলি আমাদের নয়ন মনি বঙ্গবন্ধু অতিরিক্ত উদার ও সরলমনা ছিলেন বলেই তাঁরই দলের লোক তাঁকে ডুবিয়েছে। তিনি অতিরিক্ত দেশ প্রেমিক ছিলেন বলেই অতিরিক্ত আশাবাদী ছিলেন। তাঁর এই অতিরিক্ত আশাবাদের কারণেই তাঁরই দলের ভিতর থেকে কিছু অতি উৎসাহী লোকের আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলে যা হবার ছিল তাই হয়েছিল। আর সেই ঘটনাই ছিল অনিবার্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "টু গুড ইজ টু ব্যাড।" (অর্থাৎ অতিরিক্ত ভাল মানেই অতিরিক্ত খারাপ।) কথা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আমলের কিছু কথা এসেই পড়ে। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত সমাজতন্ত্রী। তাঁর এই অতিরিক্ত সমাজতন্ত্রের কারণে তিনি মিলকারখানাগুলোকে রাষ্ট্রীয়করণ করে দেশের কি করে বারোটা বাজবে তার পথটকে মসৃণ করে দিলেন। মাশাল্লা কিছু অতি উৎসাহী লোক তো আগে থেকেই তৈরী হয়েই ছিল। যেই হুকুম সেই কাজ। ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে। শুদ্ধি অভিযান চালাতে গিয়ে অতি অশুদ্ধি অভিযান চালিয়ে ফেললেন। ফলে দেখা গেল মিলকারখানার কাঠামো ঠিক আছে কিন্তু সচল মেশিনগুলো অচল হয়ে পড়ে আছে। চাকার ঘর্ঘর, মেশিনের ঝনঝন্, শ্রমিকের হাঁক-ডাক গেছে বন্ধ হয়ে। কিন্তু সেই নিরাশ আঁধারেও আমাদের মত কিছু রবীন্দ্রভক্ত ও আশাবাদী লোক নিজেদেরকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি ঃ "এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা/ওরে বিহঙ্গ তবু বিহঙ্গ মোর।" মৃদুভাষী ধর্মভীরু লোকগুলো মনে মনে উচ্চারণ করেছে ঃ 'নিরাশ আঁধারে খোদা! তুমি যে আশার নূর।' হতাশ যুবকেরা মনে মনে উচ্চারণ করেছে ঃ 'সামনে যাই থাক ট্রেন চলবেই। যারা আরো হতাশাগ্রস্ত যুবক তারা নাটকের নাম দিলেন ঃ 'বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিন।' যাঁরা তিন আমলের বাসিন্দা অর্থাৎ একার জীবনে বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দেখেছেন তাঁরা 'ব্রিজ অন দিন রিভার কাওয়াই' দেখেছেন আর বগল বাজাচ্ছেন। তাঁরা অতি নামক বিপজ্জনক প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত নন।

যখনই কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় তখনই অতি উৎসাহী চাটুকারবর্গ ক্ষমতাসীন সরকারের খুব কাছাকাছি থাকার একটা সুবন্দোবস্ত করে ফেলেন। এ লাইনে বরাবরই তারা পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আর কে না জানে যে আমাদের

শাসকগোষ্ঠীও সামনা সামনি চাটুকারিতা পছন্দ করেন। তাছাড়া আমাদের দেশের অতি উৎসাহী লোকগুলো প্রকাশ্যে চাটুকারিতা করতে লজ্জাও করে না। কারণ ছোট বেলা থেকেই তারা ঐতিহ্যবাহী সূত্রে এই চাটুকারিতার মত গুণটা আয়ত্ব করে ফেলেছে। আর আমরা যারা সাধারণ বা সচেতন নাগরিক তারাও এই একই দৃশ্যাবলী দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যখন উৎসাহের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন আমরা প্রতিবাদ মুখর হই।

তবে একথা দিবালোকের মতই স্পষ্ট যে অতি উৎসাহ সাময়িকভাবে সুফল আনলেও এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত খারাপ। সমাজে অতি উৎসাহী লোকগুলো সমাজের কাছে শেষমেস চিহ্নিত শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

অতি উৎসাহ দেখাতে গিয়ে মীর জাফর হয়েছিলেন ক্লাইভের গাধা, আনোয়ার জাহিদ (নাকি জানোয়ার জাহিদ) হয়েছিলেন এরাশাদের ঝাড়ুদার, শাহ মোয়াজ্জেম হয়েছিলেন স্বৈরাচারী এরশাদের ফুটপাতের হকার। মরহুম কোরবান আলী তো নিজেকে কোরবানীই দিয়ে দিলেন।

অতি উৎসাহী রাজনৈতিক নেতাদেরকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের সংগে নির্লজ্জভাবে লেজুড়বৃত্তি করতে দেখা যায়। এক কালের তুখোড় নেতা আ. স. ম. আব্দুর রব নিজের আখের গোছাবার জন্য অবলীলায় স্বৈরাচারী এরশাদের পা-চাটা কুকুর হয়ে গেলেন। প্রচুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও স্বার্থের জন্য মিজান চৌধুরী হয়ে গেলেন জ্ঞানপাপী। এমনি ধরনের আরো জ্ঞানপাপী এই সমাজে আছে।

নাটকে অতিনাটকীয়তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যবহারের মধ্যে বিনয় থাকা ভাল কিন্তু অতি বিনয়ী হলেই বুঝতে হবে ভিতরে কোন স্বার্থের ব্যাপার আছে। অতএব, অতি বিনয়ীদের কাছ থেকে সাবধানে থাকাই ভালো। জ্ঞানী-গুণীরা বলেছেন ঃ বিনয় থাকা ভাল তাই বলে মাটির সংগে মিশে যেতে হবে এমন কোন কথা নয়। ইসলামে এ ধরনের কোন বিধান নেই।

অতিরিক্ত সচিব/আই জি/কমিশনার এসব পদবী দেখলে আমার খুব হাসি পায়। মনে হয় (মানে ভাষার কায়দা-কানুনে মনে হয় আর কি!) তাঁদেরকে বোধহয় দয়া করে সদাশয় সরকার চাকরিতে বহাল রেখেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসব পদমর্যদার অফিসার কি কম শক্তিশালী? তাহলে কেন এই অতিরিক্ত শব্দটি জুড়ে দেয়া হলো এর শানে নজুল জানার জন্য আমার একটা কৌতূহল আছে।

ছোট বেলার শ্রুত শ্লোকগুলি এখনও মাঝে মাঝে মনকে ভাবিয়ে তোলে।

"অতি বাড় বেড়ো না ভেঙ্গে যাবে ঝড়ে
অতি ছোট হয়ো না ছাগলে খাবে মুড়ে।"

জীবনের সর্বস্তরে দেখছি যারা বাড়াবাড়ি করে, তারা তাড়াতাড়ি মরে। মানব মুকুট হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছেন ঃ 'ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।' বড় বড় অঘটনগুলো ধর্মকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। অতি মুসলমান হওয়া যেমন ক্ষতিকর অতি হিন্দু/অতি খৃষ্টান/অতি ইংরেজ হওয়াও তেমনি ক্ষতিকর।

উপসংহারে একটি জনপ্রিয় শ্লোক বলে আজকের নিবন্ধের ইতি টানতে চাই।

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।"

শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবনে দাম্পত্য কলহ

জ্ঞানতাপস সক্রেটিস একবার বলেছিলেন ঃ সমাজে যাদের স্ত্রীরা দজ্জাল, সমাজ তাঁদের নিকট থেকে অনেক উপকৃত হয়, কিন্তু যাদের স্ত্রীরা অনেক গুণে গুণান্বিতা সমাজ তাঁদের নিকট থেকে কানাকড়ি পরিমাণও উপকার বা সাহায্য পায় না। আশা করি এর বিশদ ব্যাখ্যা না দিলেও চলবে।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে সমাজ জীবনে যাদের এত প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা তাদের ঘরের মধ্যে এত অশান্তি কেন? কিসের অভাব? আর অভাব যদি থেকেই থাকেই তবে তা পূরণের জন্য এত ঝগড়া কেন? দোষী কে? স্বামীর না স্ত্রীকুলের? স্বামীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে ঃ আরে ভাই আর বলো না এই ক্ষুদ্র রমণীর বিষের জ্বালায় আমি একেবারে নাস্তানাবুদ। স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, বলবে ঃ জানেন, আমি হয়েই ওর সংসার করছি, অন্য কেউ হলে কবে লাথি মেরে বাপের বাড়ী চলে যেত। কিন্তু হায়রে মূর্খ রমণী বাপের বাড়ী কি কোন রমণী আজীবন থাকতে পারে? হোক না সে রাজার মেয়ে। সুতরাং মেয়ে হলেই তাকে পুরুষের ঘরে যেতে হবে। এবং সেই পুরুষের ঘর করতে হলে মেয়েকে মানিয়ে নিতে হবে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয়— এ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অহরহ আমরা কলহে লিপ্ত আছি। তবু আমাদেরকে সমাজের ভিতরেই বাস করতে হচ্ছে। আমরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছি না। মানুষই মানুষের সবচে' বড় শত্রু অথচ এই মানুষকে নিয়েই আমাদের জীবন পরিক্রমা। আমাকে নিয়েই তো সমাজ নয়? হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম– স্বামী–স্ত্রীর মধ্যেও নিত্য একটা স্বার্থ স্বার্থ খেলা চলে। সেই স্বার্থটা কখনো দৃশ্যমান কখনো বা অদৃশ্যমান (ভিজিবল এন্ড ইনভিজিবল)। কখনো স্বামীর তরফের আত্মীয়–স্বজন স্ত্রী সহ্য করতে পারে না, কখনো স্ত্রীকুলের আত্মীয়–স্বজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। ভিতর ভিতর সৃষ্টি হয় একটা অহি–নকূল সম্পর্ক। শেষে দেখা যায় কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান। এমনও দেখা গেছে, যে বেশী দুর্বল সে প্রতিবাদ না করে নীরবে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায়। বাইরে থাকে শুধু খোলসটা । সমাজের মানুষ দেখে এই দম্পতি খুব সুখী। এদের জীবন যেন কপোত কপোতীর জীবন। কিন্তু আসল খবর নিলে জানা যাবে ভিতরে ভিতরে স্বামী–স্ত্রী দুজনেই ক্ষত–বিক্ষত। কোন পক্ষই একেবারে পৌঁছেচ্ছে না।

সামান্য একটা ক্ষত ব্যাপার নিয়ে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সাংঘাতিক একটা বিরোধের জন্ম হয়। একজন আরেকজনকে বুঝতে চায় না। নিজের মতামতটাকে অগ্রগামী করার জন্য স্বামীরা স্ত্রীদের মতামতকে পাত্তা দিচ্ছে না আবার স্ত্রীরাও স্বামীদেরকে তোয়াক্কা না করে সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছেন। সমাজের একদল লোক এসব নিয়েই চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছেন। সত্যি বলতে কি বেকার সমস্যা যেভাবে বানের মত বাড়ছে তাতে করে এসব আলোচনা ছাড়া কিইবা করতে পারেন এসব দল? আমরা যারা নিজেদেরকে একটু স্বতন্ত্র ভাবি তাঁরাই কি অনেক সময় এই সব ফাল্‌তু আলোচনায় জড়িয়ে পড়ি না? এবং একেকজন এক একেক রকম জোরালো যুক্তি পেশ করি। দোষারোপ করি এবং বিচারকের মত রায় ও ঘোষণা করে ফেলি। একটু আগেই বললাম

ফাল্‌তু। আসলে কি এটা ফাল্‌তু আলোচনা? মোটেই ফাল্‌তু নয়। কারণ ব্যাষ্টি থেকেই জন্ম হচ্ছে সমষ্টির। এক্ষেত্রে আমরা বল্‌তে পারি মানুষের দেহে যেমন রোগ আছে তেমনি সেই রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধও আছে। কেবল ঠিক ঠিক মত প্রয়োগ করা দরকার।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক কিছুরই তো দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। আমরা প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করছি। কখনো জয়লাভ করছি কখনো পরাজিত হচ্ছি। অর্থাৎ আমরা রেসের ঘোড়ার সহিসের মত কেবল ছুটছি আর ছুটছি। কখনো স্বামী বেচারী হচ্ছে রেসের ঘোড়া স্ত্রী হচ্ছে সহিস, কখনো স্ত্রী হচ্ছে রেস ঘোড়া স্বামী তাকে দাবড়াচ্ছে। এ জন্য বোধহয় কাউকেই দায়ী করা যায় না। কারণ এখন তো গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু নেই বলেই আজ আর কারো বুক ভরা ভালেবাসাও নেই। আর ভবিষ্যতে কারো বুক ভর্তি ভালোবাসা হবে কি না তাও জানি না। তবে আমরা দারুণভাবে আশাবাদী। আমরা এই টানাপড়েনের যুগে কাউকে প্রচুরভাবে, বিপুলভাবে ভালবাসতে পারলাম না বা কারো কাছ থেকে বুকভরা ভালবাসা পেলাম না বলে আমাদের পরবর্তী বংশধর সেই পবিত্র এবং প্রচুর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে তা হতে পারে না। তা হলে কবির সেই মূল্যবান বাণীই যে বৃথা হয়ে যাবে—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে–ভাতে।'

আমার ধারণা জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে চাইলে শুধু শুধু ইচ্ছা থাক্‌লেই চলে না সেই সঙ্গে সামর্থ্যও থাকা দরকার। সামর্থ্য অর্জনের জন্য আবার সেই ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। আমার মনে হয় ইচ্ছার প্রাবল্যের কাছে সব কিছুই হার মানে। তবে ইচ্ছাটা সঠিক পথে চালিত করতে হবে। ইদানীং আমাদের দেশের উপর দিয়ে বিদেশী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ফরেন কালচারের ক্লাইমেটে আকৃষ্ট হচ্ছি এবং আক্রান্ত হচ্ছি। পৃথিবীকে খালি চোখে আর দেখতে ভাল লাগ্‌ছে না, আমরা এখন রঙিন চোখে পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত হচ্ছি। বাবাকে আর বাবা বলতে ভাল্লাগছে না, বাবাকে বলছি ড্যাডি মাকে বলছি, "মাম্মি'। এবং এই প্রভাব আমাদের চারপাশের সমাজকে প্রভাবিত করছে। পাশের বাসার তুষারের আব্বা আবুধাবি যাচ্ছে আগামী শুক্রবার ফ্লাইটে, পল্লীগ্রামের রাজমিস্ত্রি দৈনদ্দিন যাচ্ছে সৌদি আরব মাসিক বেতন মাসে ৭০০ সৌদি রিয়াল। সুতরাং তুমি পারভিন মোস্তাকিনের স্বামী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্রাজুয়েট তোমাকেও যেতে হবে দুবাই। যা টাকা লাগে আমি পারভিন যোগাড় করব। আর যদি না যেতে পারো তাহলে তোমাকে এদেশে থেকেই পাল্লা দিতে হবে এবং জয়লাভ করতে হবে। এইবার বুঝুন ঠ্যালাটা। যাকে বলে রাম ঠ্যালা। কে যেন রসিকতা করে বলেছিল ঃ 'পড়েছি মগের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।'

আপনি আমি উনারা যারা পুরুষ–শুধু পুরুষ না শিক্ষিত এবং শক্তিমান পুরুষ তারা এ ব্যাপারটাকে কিভাবে গ্রহণ করবেন? ভাববেন নিয়তি? নাকি সময়ের ফের? না অন্য কিছু। অন্য কিছু মানে কিয়ামতের আলামতের কথাই বলছি।

বর্তমান জামানাটা একটা টারময়েল পিরিয়ড যার সোজা বাংলা ডামাডোলের যুগ। এর চেয়ে আগের জামানাই ভাল ছিল। কিন্তু এটাও একটা কাপুরুষের মত কথা। কারণ আগের জামানা যত ভালই হোক সেটা এখন ইচ্ছা করলেও আমাদের হাতে আসবে না। আমরা বর্তমান জামানরই ক্রীড়নক। বর্তমান জামানা আমাদেরকে যেমন করে নাচাবে আমরাও তেমনিভাবে নাচ্‌বো। এখন স্বামী–স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সাপ হয়ে ছোবল দিচ্ছে আবার

ওঝা হয়ে ঝাড়ছে। আমরা সময়ের হেরফেরে কখনো সাপে কাটা রোগী কখনো দর্শকের কাতারে বন্দী।

আমরা যেমন অন্যকে দেখে হাসছি আমাদেরকে দেখেও আবার অন্যরা হাসছে। অর্থাৎ আমরা কেউ সুস্থ নই। আমাদের চতুর্দিকে এখন ভাইরাস অর্থাৎ দুশ্চিন্তার ভাইরাস। আমরা তাই কাঁদতে কাঁদতে হাসছি, কখনো হাসতে হাসতে কান্নায় ভেঙে পড়ছি। আমরা তো এ অবস্থায় থাকতে চাইনি। আমরা এখন কার কাছে এই হাত প্রসারিত করবো। যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কাছে, যারা নাস্তিক তারা সাম্যবাদের কাছে গিয়ে হাত বাড়াবেন। অবশ্য হাত বাড়ালেই যে লক্ষ্যবস্তু পেয়ে যাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আপনি আমি কি চাই, আমরা নিজেরাই জানিনা। যেমন স্ত্রী স্বামীর কাছে কি চায় সে নিজেই জানে না অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে কি চায় সেটাও তিনি ওয়াকেফহাল নন। ইদানীং চলচ্চিত্র পাড়ায় চলছে বিবাহ বিচ্ছেদের মওসুম। অহরহ একজন আরেকজনের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন আবার সকাল না হতেই পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন, আমি এ বিয়ে মানি না। তবে এটা ঠিক মানুন আর নাই মানুন ঘটনা সত্য। কথায় বলে- যা ঘটে তা রটে আর যা রটে তা কিছু কিছু ঘটেও। আমরা শুধু নেপথ্যে সাক্ষী। কেউ কেউ রাজসাক্ষীও বটে। আমরা অবশ্য তেমন ধরনের রাজসাক্ষী নই। আমরা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আলোচক মাত্র। অথবা বিশ্লেষণকারী বলতে পারেন যাকে বলা হয় এ্যানালিস্ট। বিদেশে যেমন স্বামীরা এবেলা ওবেলা স্ত্রী বদল করেন অথবা স্ত্রীকূল স্বামী বদল করেন খেয়াল খুশী মতন, তেমন ধরনের একটা হাওয়া এখানেও বইতে শুরু করেছে। আমাদের দেশের ফিল্ম মহল্লায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। নাম বললে কয়েক ডজন হয়ে যাবো। যে নামগুলো সবাই জানে সে নামগুলো কি আমাকে দিয়েও উচ্চারণ করাবেন? প্রখ্যাত ড্যান্সার কাম নায়িকা অঞ্জনা, গায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন, রুনা লায়লা, আপেল মাহমুদ, সম্প্রতি মাহমুদুন্নবীর জীবনেও এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কলিম শরাফী, লায়লা আরজুমান্দ বানু, আসফউদ্দৌলা, জাভেদ, সুচন্দা, অঞ্জুকে নিয়েও খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে।

সাহিত্যিক মহলের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদের দাম্পত্য জীবন অশান্তিতে ভরপুর। অথচ তাদের খবর কেউ জানেন না। আমি একজন সাহিত্যিককে চিনি বিগত ১৪ বছর। অবশ্য তার স্ত্রীর সংগে আমার আলাপ নেই। হঠাৎ একদিন শুনলাম তিনি স্ত্রীর সংগে বিগত বারো বছর কথা বলেন না। ঢাকা পড়ে আছে তাদের কলহের কথা। একদিন আমি খুব ভয়ে ভয়ে ব্যাপারটা উত্থাপন করেই ফেললাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে সময় করে নিরিবিলিতে বসে বিস্তারিত বলবো। তুমি একটা উপন্যাস লিখতে পারবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা অধ্যাপকেরও একই অবস্থা। আরো অনেক অধ্যাপক আছেন যারা অত্যন্ত নামী-দামী ব্যক্তিত্ব কিন্তু দাম্পত্য জীবনে তারা অসুখী। অসুখী কথাটা বলাও বোধহয় আমার পক্ষে ঠিক নয়। কারণ এটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিচ্ছেদের পরবর্তী অবস্থায় তারা হয়তো সুখী। কারণ, অপারেশন-এর পরই তো রোগী ভাল থাকে। কেউ কেউ অপারেশন টেবিলেই পরপারে পাড়ি জমান। আজকের এই চমৎকার বিষয় নিয়ে লেখা সত্যি বড় দুরূহ ব্যাপার। তবে এটা নিয়ে আড্ডার আসরে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। কারণ মুখের কথার কোন

প্রমাণ থাকে না এবং প্রতিবাদও আসে না সুতরাং সেটা সব দিক থেকেই—নিরাপদ, সুখকর ও চমকপ্রদও বটে।

ভারতীয় ছায়াছবির একটি ধারালো সংলাপ বার বার আমাকে আন্দোলিত করে। তা হলো ঃ

অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়
প্রেম তখন জানালা দিয়ে পালায়।

এই কথাটা ব্যবহারিক জীবনে চরমভাবে সত্য সেটা ভুক্তভোগীরাই ভালভাবে জানেন। নিত্য অভাব মানুষকে ফতুর করে ছাড়ে। অবশ্য একজন গুণী লেখক বলেছেন ঃ প্রেম মানুষকে হয় চতুর করে নয়তো ফতুর করে। এখন আর মুখের কথায় একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে না।

সেক্ষেত্রে কিছু লেন-দেনও করতে হয়। সময়ে অসময়ে যুবক যদি যুবতীকে কলাটা, মূলাটা, সিকিটা, আধুলিটা অকাতরে বিতরণ করতে পারেন তা হলে খেলাটা জমে ভাল। নতুবা খালি মাঠে গোল দেয়ার মত নিরানন্দময় হয়ে উঠে ব্যাপারটা। এটা অবশ্য পারশন টু পারশন ভ্যারি করে। কেউ কেউ মনে করেন প্রেমই আসল বস্তুটা কিছু নয়। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ অর্থ আছে যেখানে, প্রেম আছে সেখানে। জনৈক বরিশালবাসী ঠাট্টা করে একবার বলেছিলন ঃ ভাইরে! টাকা পয়সা অদৃষ্ট, ভালবাসাই যথেষ্ট।

প্রাত্যহিক জীবনে উল্টোটাও দেখা যায়। অনেক সময় অর্থই অনর্থের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সীমাহীন দারিদ্র্য যেমন মানুষকে বিপথে চালিত করে তেমনি অতিরিক্ত প্রাচুর্যও মানুষকে বিপথগামী করে। এ কথা নারীর বেলায় যেমন সত্য নরের বেলায়ও তেমনি সত্য। অবিশ্বাস, হীনমন্যতা, অকারণে ভুল বোঝাবুঝি, একাধারে নীরবতা পালন ইত্যাকার কারণগুলো সুখী দাম্পত্য জীবনে অকাল বর্ষা বয়ে আনে। এবং একবার ভুল যদি প্রবেশ করে তাহলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কাজেই সৎভাবেই জীবনযাপন করা উচিত। অবশ্য চারদিক থেকে যে লোভ লালসা আসে না বা আসবে না তা নয় তবে সেগুলোকে চোখ রাঙানী দিয়ে বিদায় করে দেয়াই ভাল। লালসা যেন দাম্পত্য জীবনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস না পায়। আর যদি অজান্তে ঢুকেই পড়ে তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। কৃষকের অনিচ্ছায় যেমন বন্যার জল ক্ষেতে ঢুকে পড়ে, গৃহস্থের সতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও ঘরে ইঁদুর ঢুকে পড়ে, ট্রাঙ্ক-সুটকেসে রক্ষিত দামী দামী বেনারসী শাড়ীগুলোকে যেমন গৃহিণীর অজ্ঞাতসারে পোকায় কাটে তেমনি অনাহূত কতকগুলো বস্তু এসে দাম্পত্য জীবনের সুখ এবং স্পর্শগুলোকে হরণ করতে চায়। অতএব, পুরুষ রমণী উভয়কেই সাবধানে থাকতে হবে।

দাম্পত্য জীবনের বিরোধ মেটানোর একমাত্র মহৌষধ কি কেবলমাত্র দৈহিক মিলন? এটা সর্বাংশে সত্য নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা গভীর অনুভূতি থাকতে হবে। একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন পেরেশান হয়ে উঠবে। তবেই না প্রেম জমে উঠবে। দৈহিক খেলা রোজ রোজ কি ভাল লাগে? সংগে সংগে মনের খেলাও চালিয়ে যেতে হবে। কবিগুরু একবার বলেছিলেন- ইন্দ্রিয়ের দাবী যার নিকট প্রবল মন তার কাছে উপবাসীই থেকে যায়। অনেক নাদান স্বামী আছে যারা স্ত্রীর সংগে দৈহিকভাবে যুক্ত থাকেন। স্ত্রীর যে একটা ভিন্ন ধর্মী মন আছে তাকে স্পর্শই করতে চান না। মনে হয় ওটাকে স্পর্শ করলে

স্বামীর জাত যাবে। এ অবস্থায় স্ত্রী জাতিরা ক্ষুব্ধ হবেই। এ ব্যাপারে ক্ষুদ্র রমণীরাও কম না। স্বামী কি চাকরী করেন, কত টাকা বেতন পান, তার অন্য কোন দায়-দায়িত্ব আছে কিনা, তার ঘাড়ের উপর কয় ডজন সিন্দাবাদ বসে খাচ্ছেন এসব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র অথচ শক্তিময়ী রমণীকুল স্বামী বেচারীকে কাবুলীওয়ালার মত দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টায় দিচ্ছেন কেবল তাগাদা আর তাগাদা। পুরুষ হয়েছে বলে কি তার মন নেই? নাকি থাকতে নেই? দু'দিক থেকে দুজনে গুলি ছুঁড়তে থাকেন—একজন ছুঁড়েন এল, এম, জি, আরেকজন থ্রি নট থ্রি! তারপর বাড়ীটাকে বানিয়ে ফেলছেন- লেবাননের ওয়ার ফিল্ড।

হঠাৎ করে স্ত্রী সাহেবার ইচ্ছে হলো সিনেমায় বা নাটকের মঞ্চে যাবেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সেদিন সাহেবের পকেট গড়ের মাঠ। কাজেই চেহারায় ফুটে উঠলো নেগেটিভ নেগেটিভ ভাব। স্ত্রীতো রেগে একেবারে কাঁই। এ অবস্থায় কেউ যদি আগুনে ঘি-এর পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলে তাহলে বুঝতেই পারছেন একেবারে লঙ্কাকাণ্ড। অনেক সময় তাই হয়। এ অবস্থায় দম্পতিদের উচিত—পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা রাখা। স্ত্রী গরম হলে পতিরা যেন ঠাণ্ডা বরফ-এর 'কেইন' বনে যান। আর স্বামীরা গরম হলে স্ত্রীদের উচিত—বোবা হয়ে যাওয়া। কারণ বোবার কোন শত্রু নেই।

আমরা যদি বিশ্বের বরেণ্য সাহিত্যিক-শিল্পী-রাজনীতিবিদ কিম্বা দার্শনিকদের জীবনী পর্যালোচনা করতে যাই তাহলে সেখানে দেখবো এক মর্মান্তিক দৃশ্য। সে সব দৃশ্যাবলী আমাদেরকে দারুণভাবে নাড়িয়ে দেয়। আমরা স্তম্ভিত হই। টলস্টয় ছিলেন একজন ঋষিতুল্য পুরুষ। অনেক সময় লেখার পয়সাও নিতেন না। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত লোভী। এই লেডি তাঁকে মাঝে মাঝে চরমভাবে বিরক্ত করে তুলতেন। তাঁর মৃত্যু হয় দূরবর্তী একটা অখ্যাত রেলস্টেশনে। মৃত্যুর পর তার পকেটে একটা চিরকূট পাওয়া গিয়েছিল তাতে লেখা ছিল-'আমার স্ত্রী যেন আমার কফিনের পাশে না আসে।' আমেরিকার সবচেয়ে বিনয়ী ও ভদ্র প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন কিন্তু তাঁর স্ত্রীরত্নটি তাঁর জীবনটাকে একেবারে ভাজা ভাজা করে তুলেছিলেন। একবার এক রেস্টুরেন্টে বসে গরম কফি লিংকনের মাথায় ঢালতে কসুর করেননি ভদ্রমহিলা। বিশ্ব বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যার টর্চলাইট অনেক অন্ধকার অলিতে-গলিতে আলো ফেলেছে কিন্তু তাঁর নিজের দাম্পত্য জীবন তাঁর সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে নিদারুণভাবে অনুপস্থিত। তাহলে কি আমরা ধরে নেব তাঁর দাম্পত্য জীবন—। আমার আরো অনেক পরিচিত জ্ঞানী-গুণী লেখক-কবি আছে যাদের দাম্পত্য জীবন নানাবিধ অশান্তির আগুনে পুড়েছে এবং এখনও পুড়ছে। আবার কেউ কেউ ভবিষ্যতে দগ্ধীভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবনেও কম ঝড় আসেনি। তবে তিনি ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগর। তাঁর স্ত্রীরা সেই প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েকটা ঢেউ তুলেছিল মাত্র। একবার এক আড্ডায় বসে সারা রাত কাবাড় করে সকালে ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরলেন। দেখলেন স্ত্রী একেবারে রণমূর্তি ধারণ করে নির্বাক চেয়ে আছে। নজরুল তো বোকা নন। বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা করার জন্য চট করে হারমোনিয়ামটা কোলে তুলে নিয়ে গান গাওয়া শুরু করলেন ঃ

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে এলে প্রাতে পুষ্প চোর

সেদিন আশালতা সেনের ঠোঁটের কোণে নিশ্চয় হাসির চিকন ঝিলিক বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার মত কী জ্বলে উঠেনি? আমাদের অনুমান করতে খুব একটা কষ্ট হয় না।

কবিগুরুর দুটি মাত্র উক্তি থেকে আমরা তাঁর দাম্পত্য জীবনকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। (ক) 'ভাত ঠাণ্ডা গিন্নী গরম।' (খ) 'মেয়েরা ভালবাসে কড়া স্বামী আর কাঁচা আম' (গ) ঊর্মিমালাকে তার স্বামী বলছেন "এটা কি ভালবাসা না আধিপত্য?" (দুই বোন নাটকের একটি ধারালো এবং জোরালো সংলাপ) (ঘ) অন্য একটি নাটকের সংলাপ ; স্ত্রী, স্বামীকে বলছেন ঃ তোমার নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু নীচতা নয়।

কবিগুরুর গানের এই লাইনটির উচ্চারিত সুর লহরীর মাঝেও আমরা কবির দাম্পত্য জীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাই। লাইনটি হলো ঃ

"কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হলো মরি লাজে।"

তাতে কি এই প্রমাণিত হয় না যে কবিগুরু একজন পাকা সংসারী ছিলেন সেই সংগে ছিলেন ইত্যাদি—। তাঁর বৌদিকে কেন্দ্র করে নানা লোকে নানা কথা কয়। তা বলুক। আমরা আনন্দিত এবং উপকৃত এই কারণে যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অজস্র গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া, গান প্রভৃতি।

মহান কবি শেখ সাদীকে সংসার জীবনে স্ত্রীর দ্বারা দারুণভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। একটুখানি ছুতা-নাতা পেলেই স্ত্রী তাকে খোঁটা দিয়ে বলত ঃ হ্যাঁগা, তোমাকে যেন আমার বাবা, কত দিরহাম দিয়ে কিনে এনেছিল। আচ্ছা বলুন তো এসব বিষমাখা কথা একজন স্বামী হয়ে সহ্য করা যায়? তাই শেখ সাদী দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ

খালি পায়ে হাঁটা ভাল কাঁটাওয়ালা জুতার চেয়ে
পথে পথে ঘোরাও ভাল ঘরে স্ত্রীর গঞ্জনার চেয়ে।

কিছু কিছু কৌতুক ও চুটকীর মাধ্যমেও আমরা দাম্পত্য জীবনের একটা নিখুঁত ছবি পাই।

* একটি গাড়ীকে থামিয়ে ট্রাফিক পুলিশ বলল ঃ এই গাড়ীর চালক কে? স্বামী বেচারী বললেন ঃ আমার স্ত্রী। ট্রাফিক সাহেব বললেন ঃ আরে স্টিয়ারিং তো আপনার হাতে? স্বামী বললেন আমি কেবলমাত্র চালক, আসলে উনার হুকুমেই চলি।

* একটি স্ত্রীলোকের বার বার বিয়ে হয় আর স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাকে বর্তমান স্বামী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে ঃ আগের স্বামীই ভাল ছিল।

* স্বামী গাড়ী চালাতে চালাতে একবার থামিয়ে দিল গাড়ী। কারণ সামনে শুয়ে ছিল একটা গরু। স্ত্রী বলল ঐ দেখ তোমার স্বজাতি শুয়ে আছে। স্বামী ধীরভাবে বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমাকে বিয়ে করার পরে ওটা আমার স্বজাতিই হয়ে গেছে।

* একজন শ্রমিকের পর পর কয়েকজন স্ত্রী মারা গেল। এবার তৃতীয় পক্ষের আগমন। তিনি আবার বেশ রসিকা স্ত্রী। নিজে গরম ভাত খেয়ে পান্তা ভাত রেখে দেন স্বামীর জন্য। কাজের শেষে স্বামী রোজ রোজ পান্তা ভাত দেখে একদিন গরম হয়ে উঠলো। স্ত্রী তখন বলল ঃ

পানি পান্তা ভক্ষণ
এইতো পুরুষের লক্ষণ,
আমরা মেয়ে মানুষ গরম খাই
কখন আছি কখন নাই।

* একবার এক জোড়া বিদেশী দম্পতি তাদের ৭০তম বিবাহ বার্ষিকী ঘটা করে পালন করলেন। সেখানে বৃদ্ধ স্বামীকে কিছু বলার জন্য সবাই একেবারে ছেঁকে ধরলেন ঃ তিনি উঠে বেশ সুন্দর করে সংক্ষেপে বললেন। আমার ইচ্ছা, আরো ৩১ বছর বাঁচতে চাই এবং আমার স্ত্রী যেন ৩০ বছর বাঁচে। সবাই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপার? আপনি এক বছর বেশী বাঁচতে চান কেন? তিনি সহাস্যে বললেন ঃ ঐ এক বছরই আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

তুরস্কের জ্ঞান-তাপস বৃদ্ধ নাসিরুদ্দীন হোজ্জা পৃথিবীর ইতিহাসে একজন নামকরা লোক। তিনি তাঁর দাম্পত্য কলহের ঘটনাগুলোকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বাণ দিয়ে পেঁজা তুলোর মত আকাশে উড়িয়ে দিতেন। কখনো কখনো আঘাতকারীকে ধারালো বর্শার ফলার মত বিদ্ধ করতেও কসুর করতেন না।

অমর কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র বলতেন ঃ পৃথিবীর কোন স্ত্রীরাই জানে না যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে কত ভালবাসে।

যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে আসি। আপনারা জেনথেপিয়ার নাম শুনেছেন নিশ্চয়। তিনি হচ্ছেন বৃদ্ধ জ্ঞান-তাপস বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসের বউরাণী। যাকে বলা হয় ঝগড়াটে রমণী। অবশ্য ঐ রমণী দজ্জাল না হলে আমরা সক্রেটিসকে এতবড় দার্শনিক হিসাবে পেতাম না এটাও ঠিক। তিনি রেগে গেলে যা তা কাণ্ড ঘটিয়ে বসতেন। বেচারী সক্রেটিসকে ঝাঁটাপেটা করতেও কসুর করতেন না। তারপরও তার রাগ কমতো না। দোতলা থেকে থালা বাসন ধোয়া পানি ঢেলে দিতেন সক্রেটিসের মাথায়। সক্রেটিস হেসে হেসে বলতেন ঃ এত গর্জনের পর বর্ষণ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

চিঠি
'ক্রমেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি'

গাফফার সাহেবের লেখা আমার কাছে হট কেকের মতই আকর্ষণীয়। 'জনপদ' পত্রিকাটা শুধু তাঁর লেখার জন্যই অনেক পাঠক কেনে। উল্লেখিত শিরোনামের লেখাটা গো-গ্রাসে পড়লাম। খুব ভাল লাগলো।

আপনি আইউব আমলে কড়া সমালোচনা লিখেছেন, তদানীন্তন স্বৈরাচারী সরকারের মুণ্ডুপাত করেছেন। আরও অনেক দানবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে আপনার কণ্ঠ। এ জন্য আমরা আপনার নামে কলঙ্ক রটনা করি নাই। আপনি ছিলেন জনগণের লৌহ-বর্ম—আইউব মোনেমের নিকট ধারালো খঞ্জর।

খ্যাতি-অখ্যাতি নিয়ে আমি ততবেশী মাথা ঘামাই না। ঐগুলো বড় সূক্ষ্ম ব্যাপার। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুই কি কম খ্যাতি অর্জন করেছেন? তিনি যখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে সরকারের সমালোচনা করতেন আমরা মনে করতাম তিনি আমাদেরই কণ্ঠস্বর। আমাদের বিভিন্ন প্রকার

অভিযোগের কথা সরকার সমীপে তুলে ধরেছেন—সরকারের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তখন মনে হয়েছে—আরে এযে আমাদেরই কণ্ঠস্বর! তখন তিনি ছিলেন আমাদের আত্মার আত্মীয়। তার মিটিং শোনার জন্য পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু আজ? আজ তার রেডিও ব্রডকাস্টিং কানের কাছে। একটু মোচড় দিলেই শোনা যায়। কিন্তু ইচ্ছা হয় না। কারণ প্রধানমন্ত্রীর কথায় এবং কাজে বিস্তর ব্যবধান।

আপনার সামনে এক বিরাট সমস্যা- আওয়ামী লীগ গেলে কে এই দেশের ভার নেবে? গাফফার সাহেব, ঘাবড়াবেন না।

সুভাষ বোস মারা গেছেন, নেহেরু মারা গেছেন, গান্ধী মারা গেছেন বলে কি ইন্ডিয়া অচল হয়ে আছে? মানিক মিয়া মারা গেছেন বলে কি ইত্তেফাক মানুষ পড়ে না? কত উদাহরণ দেবো?

আমি একটা মফস্বল স্কুলের ৩ টাকা দামের মাস্টার। কিন্তু আপনি জানেন কি ৭৫ হাজার বেসরকারী স্কুল শিক্ষকের ভিতর এই অধমের বিশ্বাসের কি রকম তেজ? আমি মনে করি ঃ "অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো হবেরে ভবিষ্যৎ!" আমি চলার পথে প্রচণ্ড আশাবাদী। সুদিন আসবেই।

আপনি একদিনে যা মাইনা পান আমি একমাসে তা পাই। কিন্তু আপনার আশা কত দুর্বল আর আমার আশা কত শক্তিশালী। আমি জানি, স্বপ্ন একদিন সফল হবেই। অন্ততঃ এই দুর্যোগের ঘনঘটায় আমাদের আশাবাদী হতে হবে—কল্যাণমুখী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে- কিম্বা হওয়া উচিত।

আপনি খবরের কাগজের সম্পাদক হয়ে যা না পেরেছেন আমি মফস্বলের একজন সাধারণ শিক্ষক হয়ে অনেক বেশী কাজ করেছি। আমার কলমও বড় ধারালো। আমিও লিখতে পারি। আপোষহীনভাবে লিখে যাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আই, জি, এবং এস, পি'কে চিঠি লিখে গুলি খাওয়া ব্যক্তির দ্বারা সনাক্ত করিয়ে প্রকৃত ডাকাত ধরিয়ে ছেড়েছি। ৪ জন ধরা পড়েছে। তাদের দলে ৫৬ জন আছে। অধিকাংশই ছাত্র তরুণ। আপনি কাগজে লিখে কয়টা ডাকাত ধরেছেন? ধরতে পারেননি। বিকল্প কিছু পথ বের করেছেন কি? না।—দামের জন্য কিম্বা নামের জন্য প্রলুব্ধ নই। সময় আসলে নাম আপনিই হবে। সব লেখকেরই যে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে হবে এমন ধরনের কোন কথা আছে নাকি? আমরা পনেরো আনার দল। আমাদের কোলাহলে বিখ্যাত এক আনাকে মিশ্রিত করতে চাই না। উনারা স্বতন্ত্র থাকুন। আজাদ পত্রিকায় ২ বছর নিয়োগবিহীনভাবে মফস্বল সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করেছি। পয়সা চাইনি। তারাও দেয়নি। আপনার পত্রিকায় নিউজ পাঠাই। ছাপাও হয়েছে একটি। আমার ঐ এক উদ্দেশ্য জনসেবা করা। যা পারি করব। সৎ উদ্দেশ্যই আমার পাথেয়।

কিন্তু আপনি তো লিখতে লিখতে হয়রান হয়ে পড়েছেন। ভাবছেন—লিখে কি হবে? আপনার মত ঝানু সাংবাদিকের কাছে এ ধরনের নৈরাশ্যজনক কথা শুনতে আমরা রাজি নই। আপনি হবেন তাজী ঘোড়া। বার্নাড শ'র মত বলবেন ঃ 'তাজী ঘোড়ায় চড়ে যার অভ্যাস টাট্টু ঘোড়া সে ভালবাসে না।'

এক পাল ছাগলের উপর বাঘে আক্রমণ করেছে, আপনিও আর এক বাঘ হয়ে সে বাঘের আক্রমণকে প্রতিহত করবেন। তা যদি না পারেন তাহলে রামছাগল বলে প্রতিপন্ন

হবেন। কারণ জনগণের সেন্ট পার্সেন্ট নিরেট গবেট নয়। ২/৪ জন কিছু বোঝে। কলে চাপ দিলে পানি কোথা হতে আসে এটা তাদের অজানা নয়।

'৭০-এর নির্বাচনে আমরা আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করেছি ভাত-কাপড় সস্তায় পাবো বলে। তাই বলে আওয়ামী লীগের সাথে কলমা পাঠ করে আমাদের বিবাহ হয়নি কিম্বা এমন ধরনের কোন শর্ত আমরা করিনি। আরও কারণ আছে ঃ (জানিনা এ ধরনের মতামত কেউ গ্রহণ করবেন কিনা) তা হলো আমরা বাংলায় কথা বলতে চাই।

ইতিমধ্যে আপনি অনেক পাঠকের কাছে 'সৌখিন বিদ্রোহী' বলে পরিচিত। সরকারকেও হাতে রাখতে চান আবার পাবলিককে খুশী রাখতে চান। এই ব্যাপারে আপনি সফল। ইচ্ছা ছিল জনপদ পড়ব না, কিনবো না—কিন্তু আপনার লেখা পড়ার অদম্য কৌতূহলকে দমন করতে পারলাম না।

আপনার লেখা পড়ে আমরা বিশ্বাস হারাইনি। মন বলছে ঃ রাত্রি যত গভীর হয় প্রভাতের মাহেন্দ্রক্ষণ ততই এগিয়ে আসে। রাঙা—সূর্য পূর্বগগনে উদিত হবেই।

যুগে যুগে আমরা পশু-শক্তির পরাজয় দেখেছি—সামনেও তাই দেখবো—ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি—সেই সঙ্গে দেখবো একদল অনমনীয় কণ্ঠস্বর পশুশক্তি দমনের নিমিত্তে সদা সোচ্চার।

ক্লান্ত হলে চলবে না। অবিরামগতিতে লিখে যেতে হবে। কাজ একদিন হবেই। গাছ রোপণ করলে সঙ্গে সঙ্গে ফল দেয় না। কিছু সময় লাগে। আমাদের সেই ধৈর্য আছে।

আপনি যত কথা যেভাবেই বলুন না কেন সবগুলি কথায় জনগণের মনের কথার প্রতিধ্বনি আছে। আপনি তা ধরতে পারবেন না। উড়োজাহাজ কত স্পিডে চলছে তা যাত্রীর চেয়ে দর্শকই বেশী অনুভব করতে পারেন।

আপনার 'তৃতীয় মত' আবার লিখুন। আবারও আমরা লুফে নেবো। সেখানে আমাদের কথা থাকলে আমরা তা নেবো না কেন? পায়ে চলার পথ ডুবে গেলে পথিক বাধ্য হয়েই নৌকার সাহায্য নেয়। নৌকা না থাক্‌লেও চলবে। ভৈরবের গামছা তো আছেই। আমরা তাই পরে সাঁতার কাটবো।

একবার এক কবি বলেছিলন ঃ Who is tired of London is tired of life বরং কথাটা ঘুরিয়ে এভাবে বলা উচিত ঃ Who is tired of Bangladesh is tired of life. এই কথা বলেই আপনার মত শক্তিমান সাংবাদিককে (বীরদর্পে আবার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না যেন) আমরা প্রেরণা যোগাবো।

আমার একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে ঃ যে সরকারই আসুক না কেন—আপনি আমাদের হয়ে কথা বলবেন। দুঃখের দিনে সরল মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন- ওদের সঠিক পথ দেখাবেন, এটাই তো আমাদের কামনা। আপনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে নিরাশ করবেন না। সবশেষে আপনার দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে—

তরীকুল ইসলাম
শিক্ষক
লৌহজং উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
(৩-৭-৭৩ইং)

স্বাধীনতা ঃ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

ফ্রান্সের স্বাধীনতাকামী মানুষের মূলমন্ত্র ছিল—"Equality, liberty and fraternity" (অর্থাৎ সমতা, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব)। পাকিস্তানের পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মূলমন্ত্র ছিল Unity, faith and discipline (একতা, বিশ্বাস ও নিয়মানুবর্তিতা)। শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর মূলমন্ত্র ছিল "তৌহিদ" (Oneness of Almighty Allah)। স্মরণকালের স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ চার্চিলের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল "V" (অর্থাৎ Victory মানে বিজয়)। ব্রিটিশের গৌরবমুকুট মাথায় নিয়ে যিনি এসেছিলেন এবং প্রস্থানও করেছিলেন বিজয়ের গৌরব-মুকুট মাথায় নিয়ে। একাধারে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী এবং অন্যদিকে ছিলেন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ। যখনই গ্রেট বৃটেনের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে দেখতেন তখনই তিনি ব্রিটিশ জাতির সামনে প্রদর্শন করতেন "V" (অর্থাৎ Victory)। বিজয় ছাড়া তিনি অন্য কিছু বিশ্বাস করতেন না। তার দু'আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে তিনি ইঙ্গিত করতেন তার স্বভাবসুলভ হাসি মাখা ভঙ্গিতে বলতেন ঃ 'V' and only 'V' can save Great Britain and nothing else. বাঙ্গালীর গৌরব শেখ মুজিবুর রহমান যে স্মরণীয় ভাষণ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে দিয়েছিলেন তা বাঙ্গালী মুক্তিকামী মানুষকে অসীম প্রেরণা যুগিয়েছিল। বেশী সাহস যুগিয়েছিল মাত্র দু'টি বাক্যঃ 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়। রক্ত অনেক দিয়েছি প্রয়োজনে আরো রক্ত দেব, তবু স্বাধীন করে ছাড়বো এদেশকে ইনশাআল্লাহ!' বলাবাহুল্য তিনি কথাগুলো জীবনের গভীরতম আত্মপ্রত্যয় থেকেই উচ্চারণ করেছিলেন। আমাদের সবাইকে সেই গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হতে হবে। তাহলেই স্বাধীনতা হবে অর্থবহ।

এতক্ষণ ধরে যা বলা হলো তা যদি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তার জন্য প্রয়োজন হবে দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ পরিসর। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট, স্বাধীনতা এমন একটা অমূল্য সম্পদ যা না থাকলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অর্থই থাকে না। এটা বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—হাজার বছর বাঁধা অবস্থায় ছাগলের মত থাকার চেয়ে এক ঘণ্টা স্বাধীন সিংহ-এর জীবন অধিক বেশী কাম্য। কবিগুরু তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'খাঁচার পাখি' কবিতার মাধ্যমে এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। তাঁর কবিতাটি এতই স্পষ্ট যে একটি কিশোর বালকও সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। আমি মনে করি এটি বিশ্বসাহিত্যে স্বাধীনতা বিষয়ক শ্রেষ্ঠ, চমৎকার ও বোধগম্য কবিতা। এমন ধরনের আরো ডজন ডজন উদাহরণ দেয়া যায়।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস একবার বলেছিলেন ঃ Give me blood, I will give you freedom. (অর্থাৎ আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের জন্য স্বাধীনতা এনে দেবো)। অধিকার কেউ আদর করে হাতে তুলে দেয় না—অধিকার নিজের যোগ্যতা দিয়ে আদায় করে নিতে হয়। অধিকার-এর প্রশ্ন উঠলেই স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠাও স্বাভাবিক। পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সকলেরই আছে। অধিকার শব্দটা যখন আমি বুঝি তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার আরেকটি শব্দও বোঝা উচিত, সেটা হলো ঃ কর্তব্য। এবং কর্তব্য কর্ম করতে গিয়ে বাধে যত গণ্ডগোল। সেই উচিত কর্তব্য কর্ম সমাধা করতে গিয়ে

ক্ষমতাসীনদের চক্ষুশূল হতে হয়। এক পর্যায়ে জীবনকে বাজি রেখে সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়। যারা অংশগ্রহণ করেন এই সংগ্রামে তারা শুধু এক দেশের জন্য পূজনীয় তা নয় বরং পৃথিবীর সমগ্র স্বাধীন দেশবাসীর কাছে সেই সংগ্রামী বীর সন্তানেরা স্মরণকালের জন্য হয়ে যান বরণীয় ও স্মরণীয়। স্বাধীনতার জন্য জীবন দান পৃথিবীর মানুষকে ফুলের মত পবিত্র সৌরভ বিতরণ করতে থাকে। এ জীবন অর্থবহ।

কথায় বলে বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা। ইংরেজীতে একটা মূল্যবান কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। তা হলো ঃ Survival of the fittest. আমাদের সমাজে 'পোষা পাখি, 'পোষা' কুকুর' 'পোষা গরু 'পোষা হাতি' প্রভৃতি কতকগুলো জীব-জানোয়ার আছে। মনুষ্য সমাজেও এমন ধরনের কতকগুলো পোষা মানুষ আছে যারা নিয়মিত খায় দায় এবং পশুর মতই জাবর কাটে আর ঘুমায়। এদেরকে ঘানির বলদের সাথেও তুলনা করা যায়। পরাধীন মানুষকে তাই পশুর চেয়েও অধম বললেও বোধকরি কম বলা হয়। বন্য পশুও স্বাধীনভাবে বনের মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করতে চায়। সুতরাং সচেতন ও অনুভূতিশীল মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক। নদী বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তার গতি বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে স্বাধীন মানুষ বাধাপ্রাপ্ত হলেই প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রুদ্ধ হবেই। কেউ তাকে পরাধীন রাখতে পারবে না। তবে সমাজে কিছুসংখ্যক মানুষ থাকে যারা স্বাধীনতা চায় না। স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে অনেক কিছু খোয়াতে হয়। হারাতে হয় অনেক সুখ-সুবিধা। তথাকথিত ব্রিটিশ রাজশক্তি তাদের সাম্রাজ্যবাদ কায়েম রাখার জন্য এই উপমহাদেশের কিছুসংখ্যক সুবিধাভোগী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিকে রায়বাহাদুর, খান বাহাদুর টাইটেল প্রদান করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতো। এভাবে তারা দু'শ বছর গোলামীর পিঞ্জিরা দিয়ে এদেশের মানুষকে আটকে রেখেছিল। তাদের পলিসি ছিল Divide and rule. (অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করো)।

Two nation theory-কে কেন্দ্র করে ভারত ভাগ হয়ে গেল। The Muslim is a nation এ কথার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান নামে আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলো। পাকিস্তান হওয়ার পর এদেশের মানুষ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো এবং ভাবলো আমরা বোধহয় এবার সুখের মুখ দেখবো। কিন্তু সুখ এদেশের মানুষকে দেখে ব্যঙ্গ করলো। জাতির পিতা দীর্ঘ দেহের অধিকারী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রথমেই রেসকোর্স ময়দানে এসে জলদ গম্ভীর স্বরে মাইকে ঘোষণা করলেন ঃ Urdu and only Urdu shall be the state Language of Pakistan (অর্থাৎ উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা)। জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরই বেশী নাগরিক যেখানে বাংলা ভাষাভাষী সেখানে তার মত এমন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ কি করে এমন ধরনের একটা আহাম্মকী করে বসলেন আমাদের ভাবতে অবাক লাগে। '৫২ -এর ভাষা আন্দোলনই প্রমাণ করলো এদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখা মোটেই সম্ভব নয়। এরা শিকল ভাঙ্গবেই। আমরা ২৩ বছর পাঞ্জাবীদের ধারা এবং তাদের পা চাটাদের দ্বারা কৌশলে-অপকৌশলে নির্মমভাবে শোষিত হলাম। আমাদের সঙ্গী হলো জেল, জুলুম আর অত্যাচার। স্বাধীনতা পেতে হলে যেগুলো অপরিহার্য। তারপর অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হলো স্বাধীন

সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তাই গুণী-সমালোচকদের ভাষায় বলা যায় স্বাধীনতার অর্থ শুধু পতাকা বদল নয় কিংবা বাংলায় কথা বলা অথবা কবিতা রচনা নয়—আরো অনেক কিছু। তবে প্রথম ও প্রধান কর্তব্যঃ এদেশবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লালিত সেই সবুজ আকাংক্ষার বিপরীত চিত্র। যে ব্যক্তি শিক্ষার প্রতি বিতশ্রদ্ধ তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। কিছুসংখ্যক ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষকের লেবাস পরে কূটীল রাজনীতির বীজ ছড়াচ্ছেন কচিমনের ছাত্রদের মধ্যে। স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁরা যে কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যিনি পুঁটিমাছ (শর পুঁটির কথা বাদই দিলাম) চেনেন না তিনি কখনো মালিশ প্রয়োগে কখনো বা খুঁটির জোরে হয়ে যাচ্ছেন মৎস্য বিভাগের পরিচালক-মহাপরিচালক। রসায়ন শাস্ত্রের 'র'-ও বোঝেন না তিনি হয়ে যাচ্ছেন রসায়নবিদ। বাণিজ্যের 'ব'-ও বোঝেন না তিনি পার্টির জোরে অথবা মামার জোরে হয়ে যাচ্ছেন—বাণিজ্যমন্ত্রী। যিনি শিক্ষা'র সংজ্ঞা বলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তিনি বড় সাহেবের দাক্ষিণ্যে 'ওভারনাইট' হয়ে যাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী। সদস্য সংগঠিত "তৃতীয় স্বর" এর উদ্যোক্তাদের ভাষায় আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দিতে চাই (স্বাধীনতার প্রতি উন্নাসিক ও উদাসীনপন্থীদের জন্য তপ্ত লৌহ শলাকার ব্যবস্থাও আছে) "ভণ্ড সমালোচক, বেকুব সম্পাদক, সৌখিন বিদ্রোহী, সখের নৈরাশ্যবাদী, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী, মুখোশধারী রাজনীতিবিদ, নিসর্গভূক লেদাপোকা, লেবাসধারী শিক্ষক, বিদেশী ডিগ্রীধারী অনভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান, হাইড্রোজেন গ্যাস (নিজে জ্বলে অপরকে জ্বলতে সাহায্য করে না) ও সুন্দরীদের হত্যাকাণ্ডে জড়িত তরুণদের জন্য স্বাধীনতার সোনালী ফসল নিষিদ্ধ।"

স্বাধীনতার পর আমরা যে জিনিসগুলো বেশী পরিমাণে পেয়েছি তা হলো বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত নিষ্ফল সিম্পোজিয়াম, অর্থহীন সেমিনার, প্রযুক্তিবিহীন ওয়ার্কসপ এবং সঙ্গতিবিহীন ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ। যার ফল—শূন্য এবং এক একটা বিরাট শূন্য। কবির ভাষায় বললে বলতে হয়—উর্ধ্বে শূন্য, নিম্নে শূন্য, শূন্য চারিধার।

খেয়াল গান যত অস্বস্তিকর বা বিরক্তিকর হোক না কেন গানের রীতি অনুযায়ী এক সময় তা থামবেই। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। অবস্থার যত অবনতিই ঘটুক না কেন আমরা সর্বদাই আশাবাদী থাকতে চাই। কারণ আমরা জানি হতাশা আত্মার রংকে নির্মমভাবে শুষে নেয়। একজন যোগ্য সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার একটাই দাবী এদেশের প্রতিটি অফিস আদালতে কেবলমাত্র একটাই সাইন বোর্ড ঝুলানো থাকবে যার ভাষা হবে—Hope for the best but prepare for the worst. (অর্থাৎ উত্তমের জন্য আশা করা এবং মন্দের জন্য প্রস্তুত থাকা)।

আরেকটা মূল্যবান কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত। স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন স্বাধীনতাকে রক্ষা করা আরো বেশী কঠিন। এই কঠিন কর্মে ব্রতী হতে হবে আমাদের দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে। আসুন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ তুলি—"আমরা সুন্দর হবো" আমরা স্বাধীন থাকবো।

চারদিকে সন্ত্রাসের বিপুল বিস্তার ঃ দু'টি প্রস্তাব

একজন আধুনিক কবির একটি স্মরণযোগ্য উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি—"অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?" কিন্তু বর্তমানে দেশের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছেঃ সব আমলের ক্ষমতাসীন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সীমাহীন উদাসীনতা ও নীরবতা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে হতবাক করে দিয়েছে। এরই নাম কি গণতন্ত্র? নাকি এটাই গণতন্ত্রের নমুনা? সমস্ত চলমান চিত্র দেখে এটাই ধারণা করা যেতে পারে যে, যার যা খুশী সে তাই করছে এবং করবে। আর এটাই হচ্ছে স্বাধীনতার সংজ্ঞা। আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ। সুতরাং এসব আমরা করতে পারি। সংবিধান তো কারো ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে বলেনি। সুতরাং ছিনতাইকারী, সন্ত্রাসী, লুটেরা—যা করছে তাদের নিজেদের স্বার্থেই করছে।

আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এত সুন্দর একটা প্রাসাদ বানালাম যার নাম সংসদ ভবন। নির্বাচিত নেতারা সেখানে জরুরী সভা করবেন। সিদ্ধান্ত নেবেন নির্ধারিত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর। রাষ্ট্রের কল্যাণ কি করে হবে সেটা নিয়ে তুমুল আলোচনা হবে-সমালোচনা হবে এবং অবশেষে সঠিক সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? জনগণ চুলোয় যাক, আমার/আমাদের কি করে ভাতা বৃদ্ধি হবে সেটাই আসল কথা। আজ এই দুর্দিনে, দুঃসময়ে অতীতের একটি কবিতার দু'টি লাইন মনে পড়ছেঃ

"এক যে ছিল মজার দেশ
সব রকমের ভালো,
রাত্রিতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।"

সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ছে, থানায় যাচ্ছে কয়েকদিন থাকার পর জামাইবাবুর মত আবার ফিরে আসছে এই জনারণ্যে। কিন্তু যে অমূল্য জীবন খোয়া গেল তার/তাদের কি হলো? যদি সন্ত্রাসীদেরকে এভাবে লালন করা হয় তা হলে এদেশের কোন সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাটে নিরাপদে চলাচল করতে পারবে না তা হলপ করেই বলা যায়। এই সংকটময় মুহূর্তে আমার একটি ছোট্ট প্রস্তাব—যদি সন্ত্রাসীদেরকে সনাক্ত করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা যায় জীবিত/মৃত তাহলে হয়তো বা জনগণ এদের হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পেতে পারে। নতুবা আমরা তাদের কাছে জিম্মি হয়েই থাকবো। এ ব্যাপারে কাগজে লক্ষ লক্ষ লাইন ছাপা হবে কিন্তু তাদের (সন্ত্রাসীদের) একটি পশমও কেউ ছিঁড়তে পারবে না—এটাও হলপ করেই বলা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে এই সভ্য যুগে আমি কিভাবে এ রকম শাস্তি প্রদানের বিধান দাবী করতে পারি? এ রকম দাবীর পেছনে আমি যথেষ্ট যুক্তির অবতারণা করতে পারি। পারি এই কারণে যে, বিনা কারণে একজন নিরীহ নাগরিকের রক্ষিত মালামাল বা তার জীবন ধ্বংস করার অধিকার কে বা কারা সন্ত্রাসী বা হাইজারকে দিয়েছে? নিশ্চয় দেশের সংবিধান বা বি. পি. সি. তাদের জন্য এ রকম কোন সুযোগ দেননি। তারা মানে সব দুষ্কৃতকারীরা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের মত নিরীহ-নিরপরাধ-অসহায় জনগণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর আমরা তাদেরকে আদর-সোহাগ করব? এমন ধরনের সোহাগ কেউ কোনদিন করে, নাকি করা সম্ভব?

এই দুঃসময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব ঃ এই মুহূর্তে সরকারের উচিত—"দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন" নীতি অনুসরণ করা। শুধু তাই নয় যারা যারা এই সন্ত্রাসের সংগে জড়িত তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। কর্তব্য এই কারণে যে, বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদলও তাদের হিংস্র থাবা থেকে নিরাপদ নয়। তারা সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত (যদিও তারা অস্ত্র-সজ্জিত)।

এখন সকলেরই একই প্রশ্ন ঃ যে ব্যক্তি বা যে ছেলেটি বা যে মহিলাটি সকাল আটটায় বাড়ী থেকে অফিসে বা মার্কেটে গেল সে কি ঠিকমত ঠিক সময়ে পুনরায় বাড়ীতে পদার্পণ করবে? এর উত্তর মহান আল্লাহ্-তায়ালা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

আমরা সবাই দৈনন্দিন হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। এ যেন ঠিক পানা ভর্তি পুকুরের মত। সাময়িকভাবে সমাধান হলেও ঠিক পরমুহূর্তেই আবার আরেকটি নতুন সমস্যা এসে ভিড় করলো।

এই সময়ে আমাদের আরো কিছু করণীয় আছে। কেবল গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে ওরা সিন্দাবাদের দৈত্যের মত আরো ঘাড় মটকাবে। ওদেরকে রুখতেই হবে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ প্রতিটি সচেতন নাগরিক এর কাছে থাকতে হবে একটি করে বৈধ অস্ত্র যা অহেতুক প্রাণ সংহারের জন্য নয় কেবলমাত্র আত্মরক্ষার রক্ষাকবচ হিসেবেই ব্যবহৃত হবে। কিন্তু তাতেই কি শেষ রক্ষা হবে?

সেই ভয়ঙ্কর শত্রুগুলো এখনও বহাল তবিয়তেই আছে

জনপ্রিয় আধুনিক কবি সৈয়দ হায়দারের একটি কবিতার বই-এর নাম "ভুলগুলো নাড়া দেয়"। এই শিরোনামটি আমার কাছে দারুণভাবে ভালো লেগেছে। ভালো লাগার একটিমাত্র কারণ হলো ঃ এই সুন্দর শিরোনামটি সর্বকালে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যারা মূর্খ, নিরক্ষর, অজ্ঞ তারা তো হরহামেশাই ভুল করে থাকে। তাদের জন্য ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। তবু তাদের ভুলগুলো যদি নাড়া দেয় তাদেরকে তা হলে তাদের কাছ থেকেও আমরা ভাল কিছু আশা করতে পারি। আর যারা মূর্খ নয়? অর্থাৎ যারা শিক্ষিত তারা কি ভুল করে না? জীবনে চলার পথে সবাই কম-বেশী ভুল করে। কথায় বলে মুনী (মুনি) ঋষীরাও ভুল করে। এখন প্রশ্ন হলো—মুনি-ঋষীর ভুল কি শাস্তিযোগ্য নয়? আইন কি বলে এ ব্যাপারে? আমরা জানি আইন তার নিজস্ব পথেই চলে (Law will take its own course). আমরা আরও জানি আইনের চোখে সবাই সমান (All are equal in the eyes of law)। কিন্তু যারা দেশদ্রোহী? তাদের বেলায় কি আইন-কানুন অচল? আইন যদি অচল হয় তবে সে ধরনের ক্ষতিকর বা নাশকতামূলক আইন রেখে লাভ কি?

ধর্ম কি বলে? ধর্ম কি দেশদ্রোহী বা স্বাধীনতা বিরোধী লোকদের জন্য কোন প্রকার ছাড়

দিয়েছে? আমার যতটুকু ধারণা কোন ধর্মেই দেশদ্রোহীদের কোথাও কোন ঠাঁই নেই। তারা সবদেশে, সব ধর্মেই, ঘৃণীত, অবহেলিত ও অবজ্ঞার পাত্র।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আল শামস, রাজাকার, আলবদর বাহিনী স্বাধীনতাকামী বীরপুরুষদের উপর যেভাবে আক্রমণ করেছে তা ক্ষমতার অযোগ্য। সেইসব নরপশুদের কখনো কোন অবস্থায়ই ক্ষমা করা উচিত নয়। হাজার হাজার বছর পরেও তাদের নামগুলো ঘৃণার সংগে উচ্চারণ করা উচিত। যে বা যারা দেশ মাতৃকা তথা মা-বোনের ইজ্জত নির্মমভাবে কেড়ে নিতে পারে। তাদের নামগুলো কেন ঘৃণার সংগে উচ্চারণ করব না? ঐ সমস্ত কূচক্রীদের আমরা প্রকাশ্যে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর।

ভাবতে অবাক লাগে সে সমস্ত শত্রুগুলোই এতদিন পরেও সিনা ফুলিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে মিটিং করে, মিছিল করে, স্বাধীনতার পক্ষে ইসলামী লেবাস পরে বক্তব্য রাখে। ছি! ছি! শব্দটাও উচ্চারণ করতে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এদেরকে ঘৃণা করার ভাষা আমাদের জানা নেই।

স্বাধীনতার শত্রু এবং সাপের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাপকে গবেষণাগারে রাখতে হবে, সাপের বিষকে কাজে লাগাতে হবে (অর্থাৎ বিষকে ঔষধ বানাতে হবে)। স্বাধীনতার শত্রুদেরকেও খাঁচায় রাখতে হবে। তারা শ্রীঘরে থেকে তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এভাবেই তার স্বাধীনতার মাসুল দেবে। এদেরকে যারা সহায়তা করবে তারাও দেশের চরম শত্রু। তাদের অপরাধও শাস্তিযোগ্য।

প্রাণীদের মধ্যে বানর ও কুকুরকে বেশী লাই দিতে নেই। লাই দিতে গেলে তারা পাতে বসে। প্রত্যেকটি প্রাণীকে তাদের নিজেদের আসনেই রাখা উচিত আর সেটাই তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর। অনুরূপভাবে বলা যায় যারা স্বাধীনতার শত্রু তাঁরা Seasonal শত্রু নয় তারা চিরকালের শত্রু। সুতরাং তাদের ঠাঁই হওয়া উচিত কারাগারে নদী তীরের সুশোভিত রেস্ট হাউসে নয়। সাপুড়ে যেমন সাপের বিষদাঁত এক মাস পরপর ভাঙে আমরাও রাজাকারদের বিষদাঁত এক মাস পর ভাঙবো। আবার ভাঙবো। বার বার ভাঙবো। যতবার প্রয়োজন হবে ততবারই ভাঙবো। এবং ভাঙবোই।

বই চোর

না বলে পরদ্রব্য হস্তগত করা বা লোপাট করাকে চুরি বলা হয়। চুরি নিন্দনীয় কাজ। গর্হিত অন্যায়। তাই চুরি করাকে পাপ হিসেবেই গণ্য করা হয়। সেই বহুল প্রচলিত ইংরেজি প্রবাদটি স্মরণযোগ্য নানা কারণে—"টু স্টিল ইজ এ গ্রেট ক্রাইম।"

পরের জিনিস যত মূল্যবানই হোক তা পরিত্যাজ্য। কিন্তু নিজস্ব সম্পদকে যক্ষের ধনের মত আগলিয়ে রাখা উচিত। হয়তো কোন এক সময় কাজে লাগতেও পারে। সংরক্ষণের আনন্দ তো তখনই—যখন সেটা কাজে লাগলো। শুধু নিজের জন্য নয় জাতির জন্য। যে লোক শুধু নিজের জন্য ভাবে—সমাজের কথা চিন্তা করে না, তার মধ্যে এবং একটি শূকর ছানার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই ইসলামিক আইনে চোর এর হাত কেটে

ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পশ্চিমা কট্টর সমালোচকবৃন্দ এই কঠোর আইনটাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই হাত কেটে ফেলার আইনটাকে আপাতদৃষ্টিতে যত নিষ্ঠুর বা বর্বর মনে হোক আইনটা আমাদের কাছে ভালোই মনে হয়। যদি আমরা সবাই আইন মেনে চলি বা আইনকে শ্রদ্ধা করি তাহলে পৃথিবীতে কোন অঘটনই ঘটবে না। পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করবে শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ আমার গৌরচন্দ্রিকার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। বই চোর এর বিবরণ দিতে গিয়ে অকারণে একটি দীর্ঘ ভূমিকার অনাবশ্যক জাল বিস্তার করলাম। এই অহেতুক কাজটাকেই বলা হয় ধান ভানতে গাজীর গীত গাওয়া। যাই হোক, এবার বই চোর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে ইচ্ছা জাগছে। বইপড়া একটি মহৎ কাজ। বইপড়ার কাজটাকে সমাজে-রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেয়া সর্বোৎকৃষ্ট সামাজিক কাজ। অর্থাৎ বই পড়ার নেশাটাকে একবার জাগিয়ে দিতে পারলে বর্তমানের এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ কাঠামো অনেক বদলে যেত। কিন্তু তাই বলে বই চোরকে আমরা বসবার পিঁড়িটা সাদরে এগিয়ে দিতে নারাজ। বই পড়ার কাজটা ভাল কিন্তু বই চুরির পদ্ধতিটা খারাপ। বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে আর আমরা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে বন্দী। মনীষী মার্ক টোয়েন বইপড়ার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছেন ঃ চুরি করে হলেও বই পড়ুন। পৃথিবীতে এত সহজ কাজ এবং এত ভাল কাজ আছে বলে আমার ধারণায় আসে না। আমরা আড্ডা দিব, রূপচর্চা করব, সময় নষ্ট করব তবু বই পড়ব না। আর যদি বা পড়ি তাহলে চুরি করে বই পড়ব। এটা কোন সুক্ষ্ণনীতি হতে পারে? আর সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ভ্রান্তনীতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেবেন কী? তাই বই চোর থেকে আরম্ভ করে চিনি চোর পর্যন্ত সবাইকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। বই ধার করা এবং চুরি করার মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। একজন লোক মনে করুন আপনার কাছ থেকে বই ধার নিয়ে গেল। তারপর সে আর বইটা ফেরৎ দিল না এবং ভবিষ্যতে আপনার ছায়াও মাড়ালো না। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না সে লোকটা পরোক্ষভাবে আপনার বইটা মেরেই দিল? এ যেন সেই ব্যাপারটাই মনে করিয়ে দেয়—একজনের প্রদত্ত দেয়াশলাই দিয়ে সিগারেট জ্বালানোর পর দেয়াশলাইটি অজান্তে নিজের পকেটে রেখে দেয়ার মতই। কলমের ব্যাপারেও ঐ একই কথা।

বই নিয়ে ফেরৎ দেয়নি এরকম বহু লোককে আমি জানি এবং চিনি। ওদেরকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এত বড় জোচ্চুরির পরেও সেই বই চোর যদি আবারও বলে আমাকে দয়া করে অমুক বইটি দেবেন কী? আমি শত রাগ বুকে চেপে বলব, বইটা তোমার কি আজই দরকার? তারপর সেই প্রদত্ত বইটি তাকে দেখিয়ে বলব দেখতো বইটা? এই বইটি আবার আমি ফুটপাত থেকে কিনেছি। আমার উদ্দেশ্য সেই ভূতপূর্ব বই চোরটাকে পরোক্ষভাবে জুতা মারা। আমি জানি না সেই বই চোরটি এ ব্যাপারে সত্যি সত্যি অপমানিত হবে কি না।

বই চুরির ব্যাপারটাতে জড়িত আছেন—আমার নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ। কাকে কি বলবো? তাছাড়া চোরের ওপর রাগ করে কি মাটিতে ভাত খাবো? অর্থাৎ বই পড়া বাদ দিয়ে দেবো? সেই কাজটাতেও ক্ষতি হবে।

কত মানুষ (নাকি অমানুষ) যে বই নিয়ে ফেরৎ দেয়নি তার সঠিক গণনা আমি দিতে

পারব না। যদি বলেন শ্বেতপত্রও বের করতে পারি। এই শ্বেতপত্রে যাদের নাম উঠবে তারা কিন্তু আমাদের আশ-পাশেরই বিখ্যাত ও কূখ্যাত লোকজন। যাদেরকে আমার রীতিমতো সমীহ করি। অনেক সময় ভয়ও করি। একবার এক প্রতিবেদনে একটি চমৎকার গল্প বের হয়েছিল। দু'ভদ্রলোকের একই নেশা ছিল। তারা দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করতেন অনেক কিছুর বিনিময়ে হলেও।

যার বইপড়ার অভ্যাস আছে তার উচিত বই কেনা। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা উচিত বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয় না। কারণ একটা বই কিনলে—পরোক্ষভাবে বেশ কয়েকজনকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা এবং সাহায্য করা হয়। লেখক, প্রকাশক, কম্পোজিটার, প্রুফ রীডার, মেশিনম্যান সবাই উপকৃত হচ্ছে। কারো হাতে বই দেখলেই সেটা বেহাত করতে ইচ্ছা জাগে। মনের ভিতর কে যেন অজান্তে সুড়সুড়ি দেয়া শুরু করে। এবং বাঙালির দেহাভ্যন্তরে এই সুড়সুড়ির ভাবটাই বেশি যখন বুঝা যায়—বই মালিক সরাসরি দেবেন না, তখন বই মালিকের অজান্তে বইটি লোপাট করার চিন্তা বই চোরের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয় ওঠে। তারপর বইও চোর কোন এক সোনালি সুযোগে সেই আকাঙ্ক্ষিত বইটি লোপাট করে ফেলে। এভাবে একটি ভাল বই এক হাত থেকে অন্য হাতে জুয়ার তাসের মত চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ভাল একটি জিনিস কি ভাবে চুরির মাল হয়ে গেল দেখালেন জনৈক ভদ্রলোক। বাড়ি নারায়ণগঞ্জ তিনি একটি দামী বই আমার কাছ থেকে নিলেন। দেয়ার আর নাম নেই। বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। হঠাৎ করে একদিন দেখা—বললাম আমার বইটা? ও হ্যাঁ মনে আছে ভাই ; দিয়ে দেব। তারপর আরো কিছুদিন পার হয়ে গেল। হঠাৎ পথের মাঝে আরেক দিন দেখা। বললাম ঃ আমার বইটা? সে আবারো জবাব দিল ঃ ভাই বইটা দিয়ে দেব। আমি জানি সেই তথাকথিত বই চোর ভদ্রলোকটি আমার বইটি আর কোনদিন ফেরৎ দেবে না। পরে শুনলাম ঃ সে এভাবে অনেক বই চুরি করে তার একটি চোরাই লাইব্রেরী বানিয়েছে এবং সেখানে 'সাধারণের প্রবেশ নিষেধ' নামক সাইন বোর্ডটি ঝুলিয়ে রেখেছে। আগের তুলনায় বই চোরের এখন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু বই চোর নয়—সব ধরনের চোরের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব চোরকে শাস্তি দেয়া হয়, শ্রীঘরে নেয়া হয়, কিন্তু বই চোরকে কোনরূপ শাস্তি দেয়া হয় না—এই যা দুঃখ। আমরা বই চোরের শাস্তি দাবি করছি।

আমাদের সব বুদ্ধিজীবীরা কি দেশপ্রেমিক ?

রচনা লেখা শুরুর প্রারম্ভেই ভাবতে হবে বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা কি? বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন তাকেই বুদ্ধিজীবী বলা হয়। এর পরে কি কোন কথা থাকতে পারে? নিশ্চয় পারে। কারণ কোন কথাই শেষ কথা নয় এবং এটাই হচ্ছে লাখ কথার এক কথা এবং হক কথা।

প্রাসঙ্গিকভাবে কার্ল মার্কস এর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলতেন, 'আমি

নিজেই মার্ক্সবাদী নই।' কথাটা স্ববিরোধী হয়ে গেল না কি? কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অবশ্যই যুক্তি আছে। আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যিনি একজন পাকা চোর ("সাধু বেশে পাকা চোর অভিনয়"।) অথবা অভিজ্ঞ ডাকাত তিনিও তো বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই চুরি ও ডাকাতি করে থাকেন। বোকা লোক কি কখনও চুরি করে অথবা ডাকাতি করে তা হলে ধরা তাকে পড়তেই হবে।

একদল ছাত্র নকল করে পাস করলে তার সার্টিফিকেটে কিন্তু নকলের কথা লেখা থাকে না। বরং অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্রটি চাকরির নিয়োগের ক্ষেত্রে বাতিল বলেই গণ্য হবে। বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল করে বলা যাক। একটি প্রতিষ্ঠানে একজন লোক নেয়া হবে। ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজির হয়েছে বিশজন প্রার্থী। এদের মধ্যে একজন প্রার্থী নকলের জোরে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাকি উনিশজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আসলেই তারা ভাল ছাত্র। ইন্টারভিউ বোর্ডে জোর দেয়া হলো প্রথম বিভাগের উপর। অবশেষে নকলবাজ প্রথম বিভাগের ছাত্রই নিয়োগপত্র পেয়ে গেল। কারণ সেই ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটধারী বুদ্ধিজীবী (যদিও নকলবাজ)।

আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে এভাবে নকলবাজ বুদ্ধিজীবীতে ছেয়ে গেছে। আমরা কি এসব নকলবাজ বুদ্ধিজীবী অথবা দেশের শত্রুকেও দেশপ্রেমিক বলতে পারি যখন দেখি ঃ

ক) আমাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে
খ) আমাদের পদোন্নতির আশা নেই
গ) আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার
ঘ) আমার আমাদের বেকার সন্তানদের চাকুরী হবে না
ঙ) নির্বাচনে আমি/আমরা জয়ী হবো না
চ) বড় বড় প্রতিষ্ঠানে দরপত্র (কোটেশন) গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে
ছ) এমনি ধরনের আরো অনেক কর্মকাণ্ড

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ছিলেন এশিয়া মহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু। তিনি কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন চোর যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা চুরি করে এবং জীবিকা নির্বাহ করে সুতরাং তাকেও আমরা বুদ্ধিজীবী বলতে পারি। এভাবে সমাজের প্রতিটি অসৎ লোকই অসম্ভব প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। তারা প্রতিদিনই তাদের অসৎ বুদ্ধিমত্তার জোরে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু সব অসৎ বুদ্ধিজীবী লোক কখনই দেশপ্রেমিক হতে পারে না। কোন যুক্তিতেই না বরং একটা উম্মি লোককে আমরা দেশপ্রেমিক বলতে পারি কারণ সে তার প্রতিটি শোনিত বিন্দু দিয়ে দেশকে ভালবাসে এবং দেশের স্বার্থে অকাতরে কারো সাথে কোন পরামর্শ ছাড়াই নিজের মূল্যবান প্রাণকে উৎসর্গ করতে পারে।

একজন বুদ্ধিজীবীকে অনেক সময় আমরা সুবিধাবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখি। একটা পচা পুকুরকে নিমেষেই তিনি স্বচ্ছ পুকুর বানাতে পারেন, একটি খোঁড়া লোককে অবলীলায় শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ বানাতে পারেন। বুদ্ধির মার প্যাঁচে একজন ভাল লোককে মন্দলোকে পরিণত করতে পারেন একজন বুদ্ধিজীবী।

একজন বুদ্ধিজীবী তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছুরি-কাঁচি দিয়ে একজন অসৎ লোককে সৎলোক বানাতে পারেন এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হিসাবেও পুরস্কারপ্রাপ্ত

হতে পারেন এবং হাসিমুখে মঞ্চ ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তাকে আমরা কোনক্রমেই দেশপ্রেমিক বলে আখ্যায়িত করবো না। এ ধরনের কোন সংবিধান মনে হয় কোন দেশেই নির্মিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গায়ের জোরে আর সব কিছু হওয়া যায় কিন্তু গুরু হওয়া যায় না।' এ কথার রেশ ধরেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সুরেই বলতে পারি গায়ের জোরে আর সব কিছুই হওয়া যায় কিন্তু দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। কারণ দেশপ্রেমের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ভিতরে ১০০ নম্বরই পেতে হবে। ৯৯ নম্বর পেলে চলবে না।

দেশপ্রেম এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ একটি বাক্য এখানে উল্লেখ করা প্রযোজ্য বলে মনে করছি, 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী পরিয়সী।' কবি চণ্ডিদাস যেমন বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" আমাদের ধারণা সবার কিছু থাকা সত্ত্বেও তার পিতা-মাতার পরিচয় ছাড়া যেমন তার পরিচিতি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দেশপ্রেম এর ব্যাপারটা তার চেয়েও বড় সত্য এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত

ক) ডানপন্থী বুদ্ধিজীবী
খ) বামপন্থী বুদ্ধিজীবী (অতি ডান অতি বামও আছে)
গ) ল্যাদা পোকা মার্কা বুদ্ধিজীবী
ঘ) ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী
ঙ) সরল বুদ্ধিজীবী
চ) কুটিল বুদ্ধিজীবী
ছ) আমেরিকান ফরমূলায় উজ্জীবিত বুদ্ধিজীবী
জ) রাশিয়ান ফরমূলায় পরিপুষ্ট বুদ্ধিজীবী
ঝ) বিদেশী তক্‌মা আঁটা বুদ্ধিজীবী
ঞ) সেরদরে পিএইচডিপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী
ট) এ ছাড়া আরো অনেক রকম বুদ্ধিজীবী

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

দেশপ্রেমের জন্য এর চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে?

বলা হয়, 'পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না/পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।'

একজন বিদেশী বৈজ্ঞানিক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সমাজের আর দশজন মানুষের কথা না ভেবে কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে তার সাথে এবং একটা শূকর ছানার সাথে কোন তফাৎ নেই।' আমাদের দেশের অনেক ডাক-সাঁইটে বুদ্ধিজীবী এই অদ্ভুত ধরনের দূরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত। মহান আল্লাহ যত শীঘ্র তাদের অসুখ নিরাময় করেন দেশের জন্য ততই মঙ্গলজনক।'

হাদিসে বর্ণিত আছে, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? এ

দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী স্বীয় স্বার্থের জন্য সকালে এক কথা বলেন বিকেলে আরেক কথা বলেন। এরা দেশপ্রেম এর পরীক্ষায় আদু ভাই এর মত বার বার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

বিশ্বাসঘাতকতা কখনই কোন শুভ ফল আনয়ন করে না। মানুষ তাদের নাম ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করে কিন্তু দেশপ্রেমিককে মানুষ মনের মনিকোঠায় গোলাপের চারার মতই চিরকাল লালন করে। সেই দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবী নাও হতে পারে। সে হতে পারে নিরক্ষর বুদ্ধিহীন কৃষক। যে কৃষক মাটির সংগে সম্পর্কিত।

মাত্র তিনটি জিনিস চাই

জনগণের কল্যাণের জন্যই তো রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে নাকি অন্য কোন কারণে? যদি অন্য কোন কারণ থেকে থাকে তাহলে আমার জানা নেই। গৌরচন্দ্রিকা রেখে এবার আমি আসল কথায় আসতে চাই। আর সে কথাগুলো হলো ঃ

এক ঃ

সর্বাগ্রে সব কিছু বাদ দিয়ে দেশের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা হোক (সে সব যানবাহনগুলো যেন দেশেই তৈরী করা হয়। কারণ বিদেশী মাল আমদানী করতে করতে আমরাতো মিশকিনদের পাকা খাতায় নাম লিখেই ফেলেছি)। যানবাহনে সীমিত সংখ্যক আসন ছাড়া একজন অতিরিক্ত যাত্রী উঠা-নামা করতে পারবে না। করলে আইনতঃ দণ্ডনীয় বিবেচিত হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যুগে এমন প্রস্তাব অচল। উত্তরে বিনীতভাবেই বলব, এ প্রস্তাব মোটেই অচল নয় বরং যানবাহন মালিক এবং হেলপার, ড্রাইভার ও যাত্রীদের জন্য মঙ্গলই বয়ে আনবে। যানবাহন বলতে বিশেষ করে বাস, মিনিবাস ও কোচ এর কথাই বলছি। এসব যানবাহনে যখন মানুষ যাতায়াত করেন তখন মানুষকে আর মানুষ ভাবা যায় না, মনে হয় গরু-ছাগল। কিন্তু আসলে কি মানুষ তাই? কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে আমার তো মনে হয় তাই। কি জানি বাপু কোন্‌টা ঠিক?

ভাড়ার ব্যাপারে কোন সমস্যাই সমস্যা হবে না। কারণ যাত্রীদের সুবিধা দিলে যাত্রীরাও ভাড়ার সুবিধা দিতে প্রস্তুত। সীমিত সংখ্যাটার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে চাই এ জন্যে যে, এ রকম পদ্ধতি বিশ্বের সর্বত্রই চালু আছে। কারণ আমি নিজেও দেখেছি এবং বিদেশ প্রত্যাগত যাত্রীদের কাছ থেকেও শুনেছি। পদ্ধতিটা সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক। ইকোনোমিক তো বটেই। এই পদ্ধতিটা চালু করা মোটেও কঠিন নয়। কেবল সদিচ্ছাটা থাকলেই হয়।

বলা বাহুল্য শুভ্র-সুন্দর সকালে একজন বেকার যুবককে যেমন রাস্তায় দাঁড়াতে হয় অন্যত্র ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজির হওয়ার জন্য তেমনি একজন চাকুরীজীবীকেও দাঁড়াতে হয় বাসে করে চাকুরীস্থলে যাবার জন্য। কিন্তু অবিবেচক হেলপার, কন্ডাক্টর মায় মাতাল ড্রাইভার পর্যন্ত বাসের মধ্যে মুড়ির টিনের মত যাত্রী দিয়ে সমানে লোড করতে থাকেন। তারপরের অবস্থাটা অসংখ্য পাবলিকের কাছ থেকেই শুনুন...। আমি আর এগুতে চাই

না।

বিগত পাক আমল ও বাংলাদেশ আমল তক্ কত সরকার এলো আর গেলো কিন্তু যাত্রীদের ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থা করতে পারলো না। যথা পূর্বং তথা পরং। বিষয়টি অতীব দুঃখজনক।

বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কিন্তু সব সময় বেবী ট্যাক্সি বা রিক্সা-ফেয়ার যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। কারণ আয় সীমিত, প্রয়োজন অসীম। আর বড় বড় অর্থনীতিবিদরা এখানেই মার খায় দারুণভাবে। তাদের সব পরিশ্রম বৃথা যায়। তাদের পরিকল্পনা আকাশে প্রাসাদ নির্মাণের মতই অলীক মনে হয়। উপরন্তু মনে হয় পাগলের প্রলাপ। আমরা আবার নতুন করে প্রলাপ শুনতে চাই না। বাস্তব পদক্ষেপ দেখতে চাই। কারণ প্রলাপ শুনেত শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

যানবাহনের সমস্যাকে বেশী করে প্রাধান্য দিতে হবে এই কারণে যে যানবাহন ছাড়া গোটা বিশ্বই অচল। শহর থেকে গ্রামে যেতে হলে প্রয়োজন যানবাহনের, আবার গ্রাম থেকে শহরে আসতে হলে প্রয়োজন যানবাহনের, বাড়ী থেকে স্কুলে অথবা স্কুল থেকে বাড়ীতে, বাসা থেকে অফিস অথবা অফিস থেকে সোজা বাজারে অথবা দূরে .... আরো দূরে ... অথবা বহুদূরে কোথাও যেতে হলে (প্রেমিকাকে দেখতেই যান অথবা সস্তা দামে মুরগী কিনতেই যান, যে কোন উদ্দেশ্যেই যান না কেন) সর্বাগ্রে প্রয়োজন গাড়ি তারপর কড়ি। (কথায় বলে ফেলো কড়ি, মাখো তেল। আর এখন? ফেলো কড়ি, চড়ো গাড়ি।)

টাঙ্গাইলই যান, আর গাঙ্গাইলই যান যানবাহনের কথাটাই আপনাকে ভাবতে হবে। যানবাহন স্বপ্লতার প্রশ্নে একটা উত্তর আমি দিতে পারি। তা হলো যে সমস্ত অফিসে নির্ধারিত যানবাহন আছে সেগুলো আবারো সরকারী-বেসরকারী কর্মচারীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের মানুষের কল্যাণেই একটা জিনিসকে ২/৩ বার ব্যবহার করা কি অন্যায়? যেমন স্কুল-কলেজের স্বল্পতার জন্য ভালো স্কুল-কলেজগুলোতে ডবল শিফ্ট চালু করতে অসুবিধা কোথায়?

এভাবে লিখতে গেলে যানবাহনের উপরে একটা থিসিস লেখা যেতে পারে। আমি আজকে কথা বাড়াবো না শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বলব এদেশের অসংখ্য মানুষ যানবাহনের সমস্যায় আক্রান্ত। এই মুহূর্তে তাদের কথা ভাবতে হবে। গুটিকয় আমলার কথা ভাবলেই দেশের কল্যাণ হবে না।

দুই ঃ

পে-স্কেল বনাম দ্রব্যমূল্য

অথবা দ্রব্যমূল্য বনাম পে-স্কেল।

এই পোড়া চোখ দিয়ে অনেক সরকার/কোম্পানীর মালিক/বিভিন্ন স্তরের কর্তৃপক্ষের নানারকম ধান্দাবাজি বা ফন্দি-ফিকির জানলাম, দেখলাম ও শুনলাম। বুঝলাম না কিছুই। অর্থাৎ সব ব্যাটাই জনগণের মঙ্গল চান। কিন্তু শেষমেস জনগণের যেই নেংটি সেই মাথাল। সলিমুদ্দী কলিমুদ্দীই রয়ে গেল। মাঝ থেকে ফায়দা লুটলো, নেপাল আর গোপাল ।

আমাদের একান্ত দাবী, উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত কাজের টেবিলে বসানো হোক অর্থাৎ তাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হোক। সেখানে যদি একজন শত্রুর ছেলেও বসে বসুক। আমাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। স্বজন-প্রীতির বন্যা যেন আবারো আমাদের দেখতে না

হয়।

দ্রব্যমূল্যের ঘোড়া যেভাবে ছুটছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অতএব সরকারী কিম্বা বেসরকারী সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রতি খেয়াল রেখে একটা সম্মানজনক পে-স্কেল অবিলম্বে ঘোষণা করা হোক। একজন অসুস্থ, অভুক্ত, বেকার, আহত লোকের কাছে একগুচ্ছ গোলাপ অর্থহীন। তার প্রয়োজন চিকিৎসা, ভাত, চাকরি আর ঔষধ। সুতরাং এই বিষয়টি পাশ কাটিয়ে কেবল তত্ত্ব কথার কচ্কচানি দিয়ে দেশ চালানো অসম্ভব। দেশকে চালাতে হলে দেশের মানুষকে দিয়েই চালাতে হবে।

তিন ঃ

আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চাই।

কেবল আমি/আমরাই ভালো থাকবো বাকিরা সব চুলোয় যাক। এটা কোন নীতি হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তাই। একজনের ছেলে আরেক জন হচ্ছে এবং তার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান চেয়ারে উপবিষ্ট হচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে। এক চেয়ারে বসছে তার ভাগ্নে, এক চেয়ারে বসছে তার স্বীয় মামা, আরেক চোয়ারে বসছে তার আপন চাচা, কোথাও বা খালু, ফুফা ইত্যাদি। এদেশে যুগে যুগে এটাই একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। ঐ যে কথায় বলে ঃ "একবার সুযোগ দে মা লুটে পুটে খাই।" আর আমরা অসংখ্য জনগণ স্টেডিয়ামের দর্শকের গ্যালারীতে বসে বসে আঙ্গুল চুষছি আর ভাবছি এইবার বুঝি খেলাটা জমবে। খেলা জম্‌বে ঠিকই তবে পেপারে কোথাও আমাদের নাম-গন্ধও থাকবে না। থাকবে তাদের যারা খেললো। আর আমরা যারা দর্শক? তারা টিকিট কাটলাম, খেলা দেখলাম, মাথা ফাটালাম, চোখ হারালাম, তারপর ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে বাড়ি চলে এলাম। খেল খতম। বছরের শুরুতে আবার সিজন্যাল টিকিট কাটা শুরু হয়ে গেল। একই খেলা বার বার দেখতে ভাল্লাগে না। মন বিষিয়ে উঠেছে। চারিদিকে বিষের পাহাড় জমে উঠেছে। এদেশের বারো কোটি মানুষকে মনে হচ্ছে সাঁতার কাটছে একটা নর্দমায়। বলতে পারেন কেউ? আমরা কতদিন এই নোংরা নর্দমাতে সাঁতার কাটবো?

আমি প্রচণ্ড আশাবাদী। আর সেই কারণেই অধিকাংশ সময়েই নিরাশায় ভুগি। পরক্ষণে নিরাশার ভিতর আবার আশার জাল বুনি। এভাবেই কাটে আমার দিবা রাত্রি।

আমি বিশ্বাস করি মানুষ ইচ্ছা করলে মরুভূমিতেও ফসল ফলাতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বিদ্যা-বুদ্ধি আর নতুন নতুন প্রযুক্তির। নতুন প্রযুক্তির কাছে অতীতের সব ধরনের অক্ষমতা, অযোগ্যতা, মূর্খতা হার মেনেছে নির্মমভাবে। ঐ যে আমাদের পুরনো করোটিতে একটা বহু পুরাতন ধারণা কে বা কারা ঢুকিয়ে দিয়েছে—আমাদের দ্বারা কিছুই সম্ভব না। সব কিছুই সম্ভব কেবল পশ্চিমাদের দ্বারা। যেন তারাই ফেরেশ্‌তা আর আমরা এক একটা বিগ জিরো। এই বস্তাপচা ধারণাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে এখনই এই মুহূর্তে। দেরী করলেই সর্বনাশ হবে। Naw or never!

বলার অনেক বাকি রইল। সময় সুযোগ হলে আবার বলব। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে একটা ইংরাজী প্রবাদ আমাদেরকে বেশী মনে রাখতে হবে। সেটা হলো ; "প্রিপেয়ার ফর দি ওয়ার্স্ট বাট হোপ ফর দি বেস্ট"। অদ্যকার মত এখানেই যতি—ইতি নয়।

খাওয়া-দাওয়ার রকমফের

আসলে সমগ্র পৃথিবীটাই খাওয়া-দাওয়ার উপর নির্ভরশীল। খাদ্যের বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে সৃষ্টিকর্তা কেবল খাওয়া-দাওয়ার জন্যই পৃথিবীটা সৃষ্টি করেছে।

আমরা জানি পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে সুখী হতে ইচ্ছা করে না। অতএব, বলা যায় পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় শর্ত হলো সুখ লাভ করা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো খালি পেটে সুখ লাভ করা সম্ভব নয়! কথায় বলে খালি পেটে আল্লাহ্‌র নামও নাকি ভালো লাগে না। অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়াই একমাত্র সুখের আধার। দর্জির দোকান দু'এক মাস এমন কি দু'এক বছর বন্ধ থাকলেও চলবে, হোটেল একদিন বন্ধ থাকলে অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়াবে।

নাটক বলেন নভেল বলেন চলচ্চিত্র বলেন খাদ্য তার বিশিষ্ট আসন জুড়ে সর্বত্র বিরাজমান। বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই যান না কেন আপনি রকমারী খানা-পিনা পাবেন। যত বড় ধনীর দুলাল আপনি হন না কেন ভার্সিটির ডাইনিং হলে সরকারী পাতলা ডাল আপনাকে খেতেই হবে। পরীক্ষার হলে গার্ড দিতে গিয়ে শিক্ষকবৃন্দ কিভাবে মার খাচ্ছেন তা তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট এবং মার খেয়ে কিভাবে অবলীলাক্রমে তা হজম করছেন সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। আইয়ুব আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ছাত্রদের হাতে কি রকম মার খেলেন সে কাহিনীও আপনাদের জানা আছে।

অফিসের বড় সাহেবেরা যে হারে ঘুষ খাচ্ছেন সে তো চোখের সামনেই অহরহ দেখছেন। বাংলায় প্রবাদ আছে, "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।"

মানুষ আশরাফুল মখলুকাত হয়েও দিনের পর দিন কি ভাবে গরু-ছাগল-ভেড়া সাবাড় করে চলেছে। চীনারা আরও কয়েক ডিগ্রী উপরে। তারা সাপ, ব্যাঙ, আরশুলা পর্যন্ত মানে না। ইংরেজদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য শূয়রের মাংস এবং মদ।

কথায় বলে প্রথমে মানুষ মদ খায় পরে মদে মানুষকে খায় (অনুরূপভাবে বলা যায় মানুষ প্রথমে তাস খেলায় পরে তাসে মানুষকে খেলায়)।

'খোর' শব্দটা কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার আসক্তি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। যেমন বেশী গরুর মাংস খেলে তাকে 'গরুখোর' বলা হয়। অধিকমাত্রায় মদ পান করলে তাকে 'মদখোর' বলা হয়। বেশী বেশী ঘুষ খেলে তাকে 'ঘুষখোর' বলা হয়। কথিত আছে এক পুলিশ খুব 'ঘুষখোর' ছিল। ফলে তাকে বহুবার বদলী হতে হয়েছে। একবার বহু চিন্তা-ভাবনা করে তাকে নদীর ঢেউ গুনতি করার চাকুরী দেয়া হলো। কিন্তু ঘুষ খাওয়া যার মজ্জাগত দোষ সে কি কোনদিন কোন অবস্থাতে ভুলতে পারে? নদীর মধ্যে দিয়ে স্টিমার গেলে সে প্রত্যেক স্টিমারকে নদীর ঢেউ ভাঙার অপরাধে দণ্ডিত করে ঘুষ নিতো এবং এভাবে সে বিরাট ধনী হয়েছিল।

কোথাও যাচ্ছেন—আপনাকে চা, বিড়ি, সিগারেট, পান ইত্যাদি খেতে হবে। কারো কারো আদা, বচ অথবা হরিতকী খাওয়ার অভ্যাস আছে। একান্তই যদি আপনি কিছুই না খান তবুও বাতাস না খেলে চলবে না। বাতাসের সাথে ধূলাবালিও কিছু পেটের মধ্যে আপসে আপ যাবে।

এক দৈতের গল্প নিশ্চয় আপনাদের জানা থাকার কথা। একদিন এক দৈত্য রাজাকে এসে বলল ঃ আমাকে কাজ দেন না হলে আমি আপনার রাজ্যে সব খেয়ে ফেলব। ভয়ে

ভক্তিতে রাজা একের পর এক হুকুম জারি করতে থাকলেন। দৈত্যও সেভাবে পালন করতে থাকল। এক সময় রাজা হাঁপিয়ে উঠলেন। তিনি নিরুপায় হয়ে দৈত্যকে বললেন ঃ তুমি কুকুরের লেজ সোজা কর। দৈত্য তাই করতে আরম্ভ করল। অদ্যাবধি দৈত্য সেই কাজেই নিযুক্ত আছে। রাজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

দৈনন্দিন জীবনে আহারের টেবিলে ধনীরা মাছ, মাংস ও ফল-মূল খাচ্ছে মধ্যবিত্তরা কচু-ঘেঁচুসহ ভাত খাচ্ছে, আর ভিক্ষুক শ্রেণী নিরুপায় হয়ে ভাতের ফ্যান খাচ্ছে।

সম্প্রতি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় এক ক্ষুধার্ত ভিখারিণীকে কলার খোসা খেতে দেখলাম। গত কয়েক মাস আগে ঢাকার রামপুরা রোডে এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক পথে পড়ে থাকা বমি খেয়ে ফেলেছে। (১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ)

রুচিবান লোকেরা বলছেন ঃ দুর্ভিক্ষ হয়েছে বলে কী উচ্ছিষ্ট খেতে হবে? সংস্কৃতির বাহকরা বলেছেন ঃ Man cannot live by bread alone. He needs spiritual food.

পাঠে অমনোযোগিতার জন্য ছাত্র শিক্ষকের কাছে কানমলা খাচ্ছে, বেয়াদবির জন্য বেত খাচ্ছে, পরীক্ষায় ফেলের জন্য বাবা-মায়ের কাছে তাড়া খাচ্ছে।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দু'প্রকার খাদ্য একান্ত অপরিহার্য। একটা দেহের অন্যটা আত্মার। আলু, পটল, শাক-সব্জি দেহের ক্ষুধা মেটাচ্ছে, সংগীত, শিল্প, চিত্রকলা, বই, বন্ধুত্ব আত্মার ক্ষুধা মেটাচ্ছে। এ জন্য এগুলো আত্মার আত্মীয় নামে অভিহিত।

ব্যবহারিক জীবনে গাছ এবং জীব-জন্তুর ভেতর বিনিময় হচ্ছে অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইডের। জীবন ধারণের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন।

একবার এক পাগল ইঁট পাটকেল খাচ্ছিলো দেখে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ তুমি এসব খাও কেন? পাগল উত্তরে বলেছিল ঃ আমি ভাই বেহেস্তে ছিলাম, ওখানে অনেক মোয়া-মুড়ি খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এগুলোও মোয়া-মুড়ির মতই মনে হয়।

অন্য এক পাগল ড্রেন থেকে মরা ছুচো হাতের কাছে এনে বলেছিলো ঃ শালা, পিঠার আবার লেজ বেরুলো কখন? আর এক মাতালকে থানায় এনে দারোগা বলল ঃ তোমাকে কেন থানায় আনা হয়েছে জান? মাতাল বলল ঃ না। দারোগা বলল ঃ মদ খাওয়ার জন্য তোমাকে আনা হয়েছে। মাতাল দ্বিরুক্তি না করেই বলল ঃ ঠিক আছে, মদ আনা হোক। আমি রাজি আছি।

এক বাসায় এক চোর চাকর থাকতো চুরি করা তার নেশাই ছিলো। একবার তাকে ১ সের রসগোল্লা আনতে বলা হয়েছিল। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। অবশেষে সে গোল্লাগুলো রেখে সবটুকু রস খেয়ে ফেললো। বাসায় কারো বুঝতে বাকি রইল না যে এটা তারই কর্ম।

ভাবছেন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খালি মুখে যাবেন? না সেখানেও আপনার হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কথায় বলে কপালে কিল থাকলে টিকিট কাটলেও খেতে হবে। কারণ বিধির লিখন না হয় খণ্ডন।

আপনি যদি নতুন দুলাভাই হয়ে শ্বশুরবাড়ী যান তা হলে শালীদের কান মোচড়ানি, চিমটি, কিল, ঘুষি আপনাকে খেতেই হবে।

আমরা এক আজব দুনিয়ায় বাস করছি। এখানে কেউ মদ বেচে দুধ খাচ্ছে কেউ দুধ

বেচে মদ খাচ্ছে। কেউ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নেশা খেয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে আর কেউ বা নেশা করে আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত হচ্ছে। ওমর খৈয়াম তো স্পষ্টই বলে গেছেন ঃ খাও, দাও, ফূর্তি করো, কারণ আগামীকালই আমরা গোরস্থান যেতে পারি।

কবি ছন্দ গেঁথেছেন ঃ

"এ চাঁদ কিরণে মধু লুট আজ
কাল নিশীথের ভরসা কই?
চাঁদনী হাসিবে যুগ যুগ ধরে
আমরা তো আর রবনা সই!"

খৈয়াম অন্যত্র বলেছেন ঃ

"সংগে রবে সুরার পাত্র
অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য
হাতে নিয়ে।"

রম্যরচনার দিকপাল ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যের অধিকাংশ পাতাই রকমারী খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবর্তিত। কাব্যরসের চেয়ে খাদ্যরস তার নিকট অধিক কাম্য ছিল। তাঁর প্রবাস বন্ধু আবদুর রহমানের পাকের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। একবার বলেছিলেন ঃ আবদুর রহমানের খানা খেয়ে মনে হলো যেন হাফিজের একটি উৎকৃষ্ট গজল।

বাংলাদেশে একটি প্রচলিত শ্লোক আছে ঃ

'দৈ' এর আগা ঘোলের শেষ
কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ।'

বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় প্রবাদ ঃ

লাং করো তো ঠাকুর
মাছ খাও তো মাগুর।

অন্য একটি প্রবাদ ঃ

ভাতার ধরো তো পুলিশ
মাছ খাও তো ইলিশ।

তাজা কই মাছ, মাগুর মাছের ঝোল্ চিতল মাছের পেটি, রুই এর মাথা ও ফিচা; ছোট মাছের চচ্চড়ি কে না চায় বলুন? রুই মাছের মুড়িঘন্ট কি রকম লোভনীয় তা ভোজনপ্রিয় লোকের কাছে সহজেই অনুমেয়।

কবি নজরুল জনৈক ব্যক্তিকে বললেন ঃ কোথায় যাও? সে বলল ঃ পায়খানা।

কবিদা বললেন ঃ পায়খানা নয় যায়-খানা, (কারণ খানা সেখানে পাওয়া যায় না, খানা যায়)।

কবি খেতে বসে খুব রসিকতা করতেন। পানির গ্লাস দেখিয়ে কবি বলতেন ঃ এটা? এটা তোমার ভাবী, আমি অনেকবার এর পাণি পীড়ন করেছি।

কবি বায়রণ শরীরের সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য দিনে একটি মাত্র আলু খেতেন।

কবিগুরু দৈনিক এক গ্লাস নিম পাতার রস খেতেন। অনেকে মনে করতো রঙিন

পানীয়। জনেক ভক্ত সন্দেহপ্রবণ হওয়ায় কবিগুরু তাকেও এক গ্লাস খেতে দিয়েছিলেন।

কবিগুরুর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘোষণা শুনে ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত মদ খেয়ে পথে পথে আনন্দ করেছিলেন। ঐ একদিনই তিনি মদ স্পর্শ করেছিলেন।

'হাংগার' লিখে নুট হামসুন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে 'হাংগার' নামক একটি বিখ্যাত কবিতা আছে। ক্ষুধা যে বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং হিংস্র তা কবি প্রমাণ করেছেন। "ক্ষুধা ও আশা" আলাউদ্দিন আল আজাদের একখানা নাম করা উপন্যাস। সিরাজুল হকের একটি বিখ্যাত গল্প "খালি ঠোঙা"। এটাও খাওয়াকে কেন্দ্র করে। কবিতার মুখ্য বিষয়ও খাওয়াকে কেন্দ্র করে রচিত। আল্লাহ ইব্রাহিমকে বললেন ঃ অগ্নি পূজককে আমি আশি বছর পালন করেছি, তুমি এ তাকে একবেলা সহ্য করতে পারলে না?

গ্রীসের যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে সক্রেটিসকে 'হ্যামলক' পান করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি অম্লান বদনে তা মেনে নিলেন। তিনি বিষপান করার আগে ক্রিটোকে বললেন এসক্লিপিয়াসের মোরগের দামটা দিয়ে দিও। কারণ তিনি ধারে একটি মোরগ খেয়েছিলেন।

পণ্ডিতেরা তো আগেই বলে গেছেন 'ঋণাত্বক কৃতা ঘৃতং পিবেৎ (অর্থাৎ ঋণ করেও ঘি খাও)।

ভাংগা ইঞ্জিনে পানি খায় এটাতো আপনারা জানেন। কথায় বলে বোয়াল মাছের ডিম বোয়াল মাছেই খায়।

খনার বচনে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

ক) হাগ্যা খায়, খাইয়া মুতে
রোগ হয় না কোন মতে

খ) কাঁচা কাঁঠাল গাভীন গাই
যে কিনে সে মাগের ভাই

গ) কলা রুয়ে না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত

সুরসিক মুজতবা আলী বলেছেন ঃ

"ভরা পেটে ছুটতে মানা
চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর
চাকরী আগে বাঁচাই দাদা
প্রাণ বাঁচানো সে তারপর।"

একটি তুরস্ক ছোট গল্পের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ একটা পঙ্গু লোক কয়েকটি ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছে। তার স্ত্রী এ বাসায় ও বাসায় কাজ করে। লোকটি একদিন মারা গেল। তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন বাড়ী থেকে ভালো ভালো খানা এলো। তার ছেলেগুলো মজা করে খেলো। বেশ কিছু দিন পর ছেলে মেয়েগুলো পরস্পর বলাবলি করছে ঃ মা কবে মরবেরে! আবার আমরা একদিন মজা করে খাবো।

শোনা গল্প ঃ এক ছেলের বাখর-খানি খাবার সখ। কিন্তু পয়সার অভাবে খেতে পারে না। স্বপ্নে সে সত্যি সত্যি সারারাত ধরে বাখর-খানি খেলো। সকালে উঠে দেখা গেল তার

বিছানার কাঁথাটায় সবটুকু চিবিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে।

আর একটি গল্প ঃ এক ছেলে তার মায়ের কাছে বহুদিন যাবত পিঠা খাওয়ার বায়না ধরেছে। অভাবের দরুন মা তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে না। একদিন রাত্রে সে স্বপ্নে অনেক পিঠা খেলো। সকালে উঠে সে তার মাকে বলল ঃ মা তোর চেয়ে শয়তানই ভালো কারণ শয়তান আমাকে স্বপ্নর ভিতর অনেক পিঠা খাইয়েছে।

আর একটি বিখ্যাত গল্প প্রচলিত আছে। তিন জায়গার তিনজন ফকীর একত্রে ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করল। একদিন তাদের অল্প খাওয়ার জুটলো। তারা সিদ্ধান্ত নিল আজ রাত্রে যে ভাল স্বপ্ন দেখবে সেই এ খানা খেতে পারবে। সকালে উঠে একজন বয়ান করল ঃ আমি সপ্ত আসমানের উপর গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়জন বলল ঃ আমি তুর পাহাড়ে গিয়েছিলাম। তৃতীয় জন বলল ঃ তোমরা দু'জন দু'দিকে গিয়েছ এদিকে আমাকে একা পেয়ে আজরাইল বললেন ঃ তুই ভাত খেয়ে ফেল নতুবা এখনই তোর গর্দান যাবে। তাই জীবনের ভয়ে আমি ভাত খেয়ে ফেলেছি। পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখা গেল তৃতীয় জনের কথাই ঠিক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খাওয়ার সময় একটা তরকারী দিয়ে ভাত খেতেন। তিনি ছিলেন মিতাহারী। আশুতোষ মুখার্জি প্রতিদিন একটা করে রুই মাছের মুড়ো খেতেন।

এদিক দিয়ে শেরে বাঙলা সবার আগে। তিনি ছিলেন ভোজনপটু। হাত দিয়ে নারকেল ফাটিয়ে খেতেন। তিনি একবারে ৪০টি ফজলি আমও খেতে পারতেন বলে জনশ্রুতি আছে।

ছোটবেলায় রোজা করে ডুবে ডুবে পানি খেতাম আর ভাবতাম আল্লাহ্ বোধহয় দেখেন না। অনেকে ভাবে ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাপও জানতে পারে না।

নব্য প্রেমিক-প্রেমিকেরা প্রেমপত্রের শেষে লেখে ঃ

'মাছ খাইনা মাংস খাই
চিঠির যেন উত্তর পাই।'

প্রিয়জনেরা খাওয়ার সময় বলে ঃ

এটা না খেলে ওটা খাও, ওটা না খেলে আমার মাথা খাও। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কাজী নজরুল কাঠ বিড়ালী কবিতায় চমৎকার লিখেছেন ঃ

"কাঠ বিড়ালী কাঠ বিড়ালী
পেয়ারা তুমি খাও?
গুড় মুড়ি খাও?
বাতাবী লেবু লাউ?
বিড়াল বাচ্চা কুকুর ছানা তাও?
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক
খাও একা পাও যেথায় যেটুক।"

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে ঃ

After dinner rest a while,
After supper walk a mile.

লন্ডনে রান্নার উপর প্রায় ১৮/২০ খানা কাগজ বের হয়। কিন্তু আমাদের এমনই

হতভাগ্য দেশ যে এখানে রকমারী খানার জন্য ভালো বই বের হয় না। ফলে নববিবাহিতা বউগুলো শ্বশুর বাড়ি গিয়ে মুখ চুলকায়, হাত চুলকায়, কান চুলকায়।

কয়েক বছর আগে ইন্টারভিউয়ের সময় একটি প্রশ্নের জবাবে এক ছাত্র বলেছিল রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে এক প্রকার উৎকৃষ্ট হালুয়ার নাম।

নোয়াখালীর (সম্ভবতঃ) প্রচলিত প্রবাদ ঃ

ক) পিঠা খাই
মিঠার লাই

খ) যে দেশের যে ভাইল
রাঁধে মোরগ হয় ডাইল

গ) ভালোর লাইগ্যা খাইলাম জল পড়া
তাও হলো কপাল পোড়া।

কে একজন জনৈক নোয়াখালী ম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোটেলে কি খেয়েছ? সে উত্তরে বলেছিল ঃ চার আনার ভাত, চার আনার তরকারী, ডাইল হিরি (অনেক দিন আগের গল্প)।

খানা-পিনার দিক দিয়ে মোগলেরাই শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁদের সর্বশেষ সংস্করণ মোগ্‌লাই-পরোটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখনও চল্‌ছে।

হাসির রাজা নাসিরুদ্দীন হোজ্জা (মতান্তরে হোকা) একবার বাজার থেকে মাংস নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এক চিল ছোঁ মেরে মাংস নিয়ে যায়। নাসিরুদ্দীন চিলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ মাংস নিয়ে গেলে কী হবে, পাক প্রণালী কোথায় পাবে, পাক প্রণালী?

একবার দর্শন বিভাগের জনৈক ছাত্র কলেজ হোস্টেলে স্যাম্পুকে সরষের তেল মনে করে মুড়ি দিয়ে খেয়েছিল। কথাটা এখনও প্রবাদের মত মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে ঃ একজন মূর্খ লোকের সাথে হালুয়া খাওয়া অপেক্ষা একজন জ্ঞানী লোকের সাথে ঝগ্‌ড়া করা শতগুণে উত্তম!

স্ত্রী রত্নটি স্বামীর উপর রেগে গেলে বলে ঃ চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? এটা কি করেছ? কিছু একটা ছুতা-নাতা পেলেই স্ত্রীরা প্রায় বলে তুমি এ ধরনের কাজ করলে ... আমি বিষ খেয়ে মারা যাবো।

হযরত ইউনুছ (আঃ) কে মাছে গিলেছিল এ কাহিনীর বিবরণ অনেকেই জানেন। কিন্তু মাছ তাঁকে হজম করতে পারেনি। পরে তিনি এক দ্বীপের মধ্যে উঠেছিলেন। কথিত আছে সেখানে তিনি লাউ খেয়ে বেঁচে ছিলেন। সস্তা খানার ভেতর লাউ যে কত উপকারী এবং লাউ থেকে কত রকমারী খানা হতে পারে তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। অর্থাৎ লাউ-এর প্রতেকটি অংশ প্রয়োজনীয়। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ লাউ নিয়ে একটা সুন্দর রম্য রচনা লিখেছেন।

আমেরিকার এককালীন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড জীবনে দু'বার উল্লেখযোগ্য আছাড় খেয়েছিলেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুনও সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কলার খোসায় আছাড় খেয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ছেলে বেলায় আমরা সুর করে পড়তাম ঃ হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।'

ননী চুরি করতে গিয়ে কৃষ্ণের অবস্থা যে নাজেহাল হয়েছিল এ ঘটনা অনেকেরই জানা আছে।

গুরুদেব কবীর একবার বলেছিলেন ঃ আমি সকল নদীর পানি খেয়েছি সকল পানিই এক।

মহাত্মা গান্ধী নিয়মিত ছাগলের দুধ খেতেন তাতো ইতিহাস প্রমাণ করে।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দের গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রাকালীন তাঁর স্ত্রীকে সংগে নিয়েছিলেন কেবল রান্নার জন্য। কারণ তিনি ছিলেন শুচী ব্রাহ্মণ।

রাসুলুল্লাহ্ বলেছেন ঃ

'জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি,
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে ফুল
কিনে নিও হে অনুরাগী।' (অনুঃ সত্যেন দত্ত)

খাদ্য এমন এক চীজ যাকে অস্বীকার করা মানেই জীবনকে অস্বীকার করা।

জনৈক চীনা দার্শনিক ছুটির দিনে অভিধান পড়তেন। তিনি মাতালের মত শব্দ পান করতেন আকণ্ঠ। জনৈক ইংরেজ কবি মনের মত শব্দ না পেলে চার/পাঁচ দিন মাটিতে গড়াগড়ি দিতেন।

কবি নজরুল কবিতা লেখার সময় পাশে রাখতেন এক ডিব্বা পান ও এক ড্রাম চা। কথিত আছে শরৎচন্দ্র গাঁজায় দম না দিলে নাকি লিখতে পারতেন না।

হালে কিছুসংখ্যক আধুনিক গদ্য কবিরাতো রীতিমত নুরা পাগলার আসরের রেগুলার মেম্বার। তাঁদের মত হলো ঃ গাঁজা, সিদ্ধি, ভাং চরস এসব হলো কবিতার প্রাণ। কাজেই এগুলো যত পারো খাও। মাফ করবেন বাংলা মদের কথা উল্লেখ করতে পারলাম না বলে।

নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখানকারী জাঁ পল সার্ত্রে তার অধিকাংশ রচনা রেস্টুরেন্টে বসেই লিখেছেন। আমার এক বন্ধু হোটেলে বসে একটা চমৎকার ছোট গল্প লিখেছিলেন দু'ঘণ্টায়—নাম ঃ কবরের সংলাপ। তার নাম আনোয়ারুল আবেদীন (গীতিকার)। কে জানে খাদ্যের ঘ্রাণেই হয়তো লেখা পূর্ণাংগ রূপ পায়।

কথায় বলে ঃ গুড় ছিটালেই পিঁপড়া আসে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। পেট ভরে ভাত দাও, পিঠ ভরে কিল দাও।

লোক বিশ্বাস থেকে জানা যায় ঃ কোন হিন্দুকে জাতে তুলতে হলে তার শাস্তি স্বরূপ কোশা কুশীতে তাকে পঞ্চগব্য সেবন করাতে হয়।

ইসলামে সুদ খাওয়া গর্হিত অন্যায়। একজন মুসলমানের সুদ খাওয়া আর বিষ্ঠা খাওয়া একই কথা। কথায় বলে যে গরু বিষ্ঠা খায় সে তার অভ্যাস ছাড়তে পারে না।

বাংলায় প্রবাদ আছে ঃ 'ভাত দিবার ভাতার না, কিলোবার গোঁসাই।'

হাসির রাজা গোপাল ভাঁড় একবার শ্লোক কেটেছিলেন ঃ

'চিন্তা চিন্তা মহা চিন্তা
আর এক চিন্তা ভাত
ষোলশ' বিদ্যা পেটে রেখে
স্কন্ধে ত্রিশূল কাঠ।'

শিশুসাহিত্য কেন্দ্র

বলা বাহুল্য সেদিন তার বাসায় চাল বাড়ন্ত ছিলো।

বরিশালের বালাম, পদ্মার ইলিশ, গোপালগঞ্জের রুই, মগ্‌রা নদীর মসুল মাছ, নাটোরের কাঁচা গোল্লা চলন বিলের শিং-মাগুর, রাজশাহীর আম, পোড়াবাড়ী ও শিবগঞ্জের চমচম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার চিড়া, দৈ, দিনাজপুরের সরু চাল, মোহনগঞ্জের বিরুই, ঢাকার গাওয়া ঘি, রামপালের কপি, নরসিংদীর কলা, মুক্তাগাছার মণ্ডা, সিরাজগঞ্জের রাঘবসাই, বগুড়ার ক্ষীর ও দই সিলেটের আনারস ও কমলা, চাটগাঁয়ের শুঁটকি মাছ, খুলনার ডাব এর কোন তুলনা হয় না। কুমিল্লার হুক্কা, রংপুরের তামাক ও নওগাঁর গাঁজায় যদি জোরসে টান দিয়ে একবার ধ্যানে বসে যেতে পারেন তা হলে হয়তো প্রথম দর্শনেই দেব দর্শন হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশকে তো কিসিঞ্জার সাহেব অনেক আগেই আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ বাংলাদেশে খাদ্য নেই। অথচ এই বাংলা একদিন ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল। এখানে পুকুর ভর্তি মাছ ছিল, গোয়াল ভর্তি গরু ছিল, গাল ভর্তি পানও ছিল। কিন্তু বর্তমানে এসব রূপকথার কাহিনী।

মানুষ যে হারে বাড়ছে তাতে দেখা যাবে আর ক'বছর পর মানুষ মানুষের মাংস খাচ্ছে। 'জনসংখ্যা' নাটকের নায়ক তাই সবকিছু খেয়ে ফেলছে এক এক করে।

অভাবে পড়ে এক ভদ্রলোক হুক্কা বিক্রি করে চাল এনেছিলেন। ভাত খাওয়ার সময় ছেলেকে বললেন ঃ সেলিম, কি খাচ্ছ?

সেলিম ঃ ভাত খাচ্ছি আব্বা।

বাবা ঃ ভাত নয় হুক্কা খাচ্ছ। কারণ হুক্কা বিক্রির টাকা দিয়ে চাল আনা হয়েছে।

পোকা-মাকড়ের খোরাকি হচ্ছে বই। তারা নির্বিবাদে বহু লেখকের ফসল খেয়ে ফেল্‌ছে। তাই কবি দুঃখ করে বলেছেন ঃ

'উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার।

ধনীরা কি ভাবে কৌশলে গরীরের রক্ত পান করছে সে তো খালি চোখে দেখাই যায়। সঞ্জীব বাবু সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন 'পালামো' বই-এ। 'গাছগুলো কি রসিক-নীরস পথের থেকে রস সঞ্চয় করে বেঁচে আছে।' ভ্রমণ শেষে বলছেন 'গাছগুলো কি শোষক, নীরস পাথর থেকেও রস নিয়ে বেঁচে আছে।'

একবার এক বোকা ছেলে হাটে আতরের দোকানের সামনে বসে বসে ভাবছিল আতর কি কাজে লাগে? এক সময় সে আতর খেয়েই ফেলল। খাওয়ার সময় তার গ্রামের এক ছেলে দেখে ফেলল। সে তার বাবাকে বলে দেবে বলে ভয়ও দেখালো। এমন কি বলে বসলো যে তোমার ছেলে আতর খেয়েছে। উত্তরে বোকা ছেলেটির বাবা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ হারামজাদা আতর এমনি এমনি খেলি কেন রুটি দিয়ে খেতে পারলি না?

শুঁটকির সাথে বিড়ালের কি সম্পর্ক, কাঁঠালের ভুতির সাথে মাছির কি সম্পর্ক, গুড়ের সাথে পিঁপড়ার কি সম্পর্ক তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত সবগুলো সম্পর্কই খাওয়া-দাওয়ার সাথে অন্বিষ্ট। এত কিছু জেনে শুনেও যদি আপনি শেয়ালের কাছে মুরগী বখ্‌রা দেন তা হলে আমাদের বলার কিছু নেই।

বর্তমানে শিশুখাদ্য নিয়ে যে ঘাপলাবাজি চলছে তা দেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ।

দেশে যখনই রাজনৈতিক ঋতু বদল হয় তখন তার 'মেইন ইস্যু' থাকে 'ফুড প্রব্লেম'। তাছাড়া খাদ্যে বিষ ক্রিয়ার ফলে বহু লোক 'স্ট্রং' ডাইরিয়ায়' প্রায় কষ্ট পায়। এদের শাস্তি হওয়া একান্ত অপরিহার্য।

আল্লাহর দোস্ত পিয়ারে নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর উম্মতের কষ্ট দেখে নিজে কত দিন পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটিয়েছেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তার ছেলের গুড় খাওয়া নিয়ে রসুলুল্লাহ'র কাছে অভিযোগ করলেন। রসুলুল্লাহ্ তাকে কয়েকদিন পর বললেন ঃ বাবা গুড় খেয়ো না। তিনি নিজে সংযমী হয়ে অন্যকে নিষেধ করলেন। এরূপ মহৎপ্রাণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি আমাদের মাথার মুকুট হয়ে আছেন।

শেখ সাদী একবার এক ভোজসভায় ছিন্নবস্ত্র পরিহিত ছিলেন বলে অবহেলিত হয়েছিলেন। তারপর ভালো পোষাক পরে গিয়ে ভালোভাবে আপ্যায়িত হয়েছিলেন। কিন্তু খানা ঢুকাচ্ছিলেন পোষাকের পকেটে কারণ বাহাদুরীটা পোষাকেরই। আশা করি এ গল্প অনেকের জানা আছে।

বিশ্বের অধিকাংশ গরীব দেশে চল্‌ছে খাদ্য ঘাটতির সমস্যা। তবে ধনী দেশগুলোও সমস্যামুক্ত নয়। তারা অধিক ভিটামিনের জন্য ভুগছে আর গরীব দেশগুলো পুষ্টিহীনতায় ভুগ্‌ছে।

ধনী দেশগুলো মহাশূন্যে যতই মিতালী পাতাক না কেন মর্ত্যের খাদ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করলে চলবে না কারণ এটা মৌলিক সমস্যা। বৈজ্ঞানিকগণ যদি কোটি কোটি লোককে ক্ষুধার্ত রেখে মহাশূন্যে স্ফূর্তি করেন তা হলে সেখানে আনন্দ থাকতে পারে, গর্ব থাকতে পারে তবে মানব-কল্যাণ নিহিত আছে কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটা আমার আবেদন রইল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত সংলাপটি স্মরণযোগ্য ঃ

'দাদা ঃ (নাতিকে লক্ষ্য করে) সিগারেট কখনো খাবি না, ও হচ্ছে মানুষের পরম শত্রু।

নাতি ঃ শত্রু বলেই তো তাকে পোড়াচ্ছি।

একদা জনৈক বিদেশী কবিরাজ আরবে গিয়েছিলেন। বেশ কিছু দিন অবস্থান করার পরও একটাও রোগী পেলেন না। তিনি জনৈক নাগরিকদের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল। এখানকার লোকের বৈশিষ্ট্য, তারা ক্ষুধা না পেলে খায় না এবং রাত্রিবেলায় কম খায়। ফলে তাদের অসুখ-বিসুখ হয় না। কাজেই কবিরাজ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

কেরালার দুর্ভিক্ষে ইন্দিরা গান্ধী ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি ছোটবেলা থেকেই ফলমূল খেয়েই জীবনযাপন করেন।

ইংরেজরা খাওয়ার ব্যাপারেও সন্দেহ প্রবণ। তাই তারা হাত দিয়ে না খেয়ে কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেন, জাপানী ও চীনারা কাঠি দিয়ে খান।

খাওয়ার ব্যাপারে কাক এবং কুকুরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। একটা মরা গরু একটা কুকুরের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয় জেনেও সে আগলিয়ে বসে থাকে কিন্তু কাকেরা সেটা সমবায় ভিত্তিতে উল্লাস করে খেতে পছন্দ করে। শকুনেরাও এই পর্যায়ে পড়ে।

ছোটবেলায় পরীক্ষা চলাকালীন আমার দাদী প্রায় কচুর শাক রান্না করতেন কিন্তু ডিম

খেতে দিতেন না। আর কলা দেখলেতো রেগে টং হয়ে যেতেন। দাদী ছড়া বলতেন ঃ

'খাও কচু
পাইবা কিছু।

কারণ আগের দিনের লোকেরা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো বেশী মাত্রায়।

বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কার্লমার্ক্স দশ কথার এক কথা বলেছেন ঃ একটা লোক ভাল খাওয়া না পেলে ভালোভাবে চিন্তাও করতে পারে না। স্বার্থের প্রশ্নে বলেছেন ঃ মা তার ছেলেকে চুমু খায় সেখানেও স্বার্থ জড়িত আছে।

জ্ঞানীরা বলেছেন ঃ বাঁচার জন্য খাও, খাওয়ার জন্য বাঁচিও না। জ্ঞান তাপস সক্রেটিসও বলেছেন ঃ অন্যেরা খাওয়ার জন্য বাঁচে আর আমি বাঁচার জন্য খাই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মোক্ষম বলেছেন ঃ "একটি দিনের মধ্যে তিনবার উদর পূর্তি করে ভোজন করার কাজটি নিকৃষ্ট প্রকারের জীবন যাপনের নামান্তর।"

বিশিষ্ট লেখক কাশতকার যে কটি মন্তব্য করেছেন সবগুলোই যুক্তিযুক্ত। পাঠকের জ্ঞাতার্থে তা উল্লেখ করছি ঃ

ক) খাদ্যের প্রশ্ন দুনিয়ার সকলের প্রশ্ন। ইহার সমাধানও সকলে মিলেই করতে হবে।

খ) প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের চিন্তাই বর্তমানে চিন্তার খাদ্য।

গ) মানব সমাজে যে সকল কারণে অশান্তি দেখা দেয় তন্মধ্যে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ দুটো প্রধান কারণ। দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি কায়েম করতে হলে উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে।

ই, ই, ডব্লিউ হাই যা বলেছেন তা বেশ মজাদার। তিনি বলেছেন ঃ অধিকাংশ লোক এমনভাবে খায় যেন তারা নিজেদেরকে বাজারে বিক্রীত হবার মত চর্বিদার করার তালে আছে।

খাওয়ার ব্যাপারে কোরানের বাণী সর্বাগ্রে গণ্য ঃ তোমরা খাও এবং পশুদের খেতে দাও।

গ্রামের দিকে এখনো একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে ঃ

রোজা করা যেমন তেমন সরবতটুকুর আশাই বেশী।

বিক্রমপুরে একটি প্রচলিত প্রবাদ ঃ সিন্নীর বেলায় মন্তার মা খেতার বেলায় আমি না।

চুরি করে এক ব্যক্তি কাঁঠাল খেয়েছিল। বিচারে বসে রায় হলো যে চুরি করে কাঁঠাল খেয়েছে তার মাথায় আঠা থাকবেই। চোর মনে করল হয়তো হতে পারে। অবশেষে চোর তার অজান্তে হাত দিল এবং সে ধরা পড়ল।

কথিত আছে যে একবার এক পাঠান্ কাঁঠাল খাওয়ার প্রক্রিয়া না জানায় তার দাড়ি মোচে কাঁঠালের আঠা লেগে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে পুরো দাড়িমোচই কর্তন করতে হয়। পথে আর একজন 'ক্লিন শেভ' লোক দেখে সে মনে করল ইনিও বুঝি কাঁঠাল খেয়ে এ অবস্থা করেছেন। তারপর আলিঙ্গন করে বলল ঃ তুম ভি কাঁঠাল খায়া, হাম্ ভি কাঁঠাল খায়া।'

আমাদের নানী-দাদী মায় জননীরা পর্যন্ত আল্লাহ্-রসুলের কসম খেতে ওস্তাদ। এমনকি ছেলে মেয়ের মাথায় হাতে দিয়েও কসলম খায়। এ ছাড়াও আমরা তো হরহামেশাই বিষম খাই। কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে কেউ গাল দিলে বা স্মরণ করলে

'বিষম' খায় বা হাঁচি দেয়। এ সমস্ত দেখে শুনেই হয়ত সুকুমার রায় বলেছেন ঃ "এত খেয়ে তবু যদি নাহি উঠে মনটা/খাওয়া তবে আলু পোড়া খাও কচু ঘন্টা।'

গ্রামের মুরুব্বীরা বলেন, হুক্কা সম্পর্কে একটা ছড়াও প্রচলিত আছে ঃ

'এর নাম বাংলাদেশের গাঁজা
এক চিলিমে যেমন তেমন
দুই চিলিমে মজা,
তিন চিলিমে উজির নাজির
চার চিলিমে রাজা।'

খাওয়া-দাওয়া সম্পর্ক এ ধরনের আরও অনেক চুটকী প্রচলিত আছে। আরেকদিন আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

গণতন্ত্র একটি রাক্ষস-কবলিত রাজকন্যা

প্রথমেই ধরা যাক, নেপোলিয়নের—Basic Democracy (মৌলিক গণতন্ত্র)। পরে ধার করলেন-ফিল্ড মার্শাল মুহঃ আয়ুব খান—পাকিস্তানের তদানীন্তন জঙ্গী প্রেসিডেন্ট। বাংলায় যার নাম বুনিয়াদী তন্ত্র।

সুকার্ণোর (বাংকার্ণো)—Guided Democracy (নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র)। Abe Lincoln এর সার্বজনীন তণতন্ত্র (Universal Democracy—সার্বজনীন গণতন্ত্র)। আমেরিকায় নতুন হালে Amercian Democracy (আমেরিকান গণতন্ত্র) বা Own Made Democracy) স্বেচ্ছা প্রণোদিত গণতন্ত্র)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র Religious Democracy (ধর্মীয় গণতন্ত্র এবং তার থিওরী হলো ঃ The Muslim is a nation (দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে)। বাংলাদেশের—Whimsical Democracy (খামখেয়ালী গণতন্ত্র) or Borrowed Democracy (ধার করা গণতন্ত্র)।

আমরা দুশো বছর বৃটিশের গোলাম ছিলাম। তার আগে আমরা কি ছিলাম সেটা আলোচনা করবেন বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ। তারপর স্বাধীন হলাম ১৯৪৭ সালে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে।

ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী জিন্নাহ সাহেব দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের কিছুসংখ্যক মুসলমানকে একদিকে করে বিজ্ঞ দার্শনিকের ভঙ্গিতে সারসের মত গলা উঁচু করে বললেন : The Muslim is a nation. So, they should have a separate state তার এই প্রস্তাবে বাহবা দেবার মত কী থাকতে পারে তা আমি আজও খুঁজে পেলাম না। আসলে প্রস্তাবটাই ছিল fool's proposal and it was an unreal proposal তার কথা অনুসারে ধরে নিলাম ঃ মুসলমান একটা জাতি সুতরাং তাদের জন্য আলাদা একটা বাসভূমির প্রয়োজন। প্রস্তাবটা ঠিক এই রকম ঃ একদিকে মোহন বাগান আর একদিকে মোহামেডান, দেখা যাক কে হারে, কে জিতে। তাঁর প্রস্তাবটাই আগা গোড়া গলদপূর্ণ। তদুপরি অবাস্তব। ভিত্তিহীন।

জিন্নাহ সাহেবের বড় ছেলে হলো। নাম রাখলেন পাকিস্তান। বিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা জিন্নাহ সাহেবের চেয়ে আর এক কাঠি সরস। তারা বললেন ঃ P অর্থ = Punjab, A অর্থ = Afganistan, K অর্থ = Kashmir, I অর্থ Indus, Stan অর্থ = Baluchistan পুরোধা হলেন Choudhury Rahmat Ali. A অর্থ Afganistan একটি আলাদা state। অথচ বৈজ্ঞানিক জিন্নাহ সাহেব তাকে কান ধরে পাকিস্তানের সীমানায় নিয়ে এলেন, Kashmir! ঈস এমন ভূস্বর্গ কে না চায়। তিনি সৃষ্টি করে গেলেন একটা পচনশীল ঘা। অথচ পাকিস্তানে কাশ্মীরের কোন নাম গন্ধও ছিল না। লিয়াকত আলী খান শরীফ আদমী, ক্যাপ মাথায় দিয়ে তর্জনী উঁচু করে বললেন ঃ কাশ্মীর শেখ আবদুল্লাহর বাবার সম্পত্তি নয়।

আমরা কিন্তু হুঁ হুঁ পরামানিক ; মানে জি হুজুরের দল। ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না। আর বুঝেই বা কি লাভ? কে শুনে কার কথা? কারণ রক্তে আমাদের ইসলামী জোস। তার উপর বাঙালি শ্রেষ্ঠ জাতি। কারণ সকলেই শ্রেষ্ঠ বলে বাঙালি জাতটাকে পঙ্গু করে রেখেছে।

এখনও আমরা বিজ্ঞের মত বলি (এত নাকানী-চুকানী খাওয়ার পরও) What Bengal thinks today India thinks tomorrw and the rest of the world think, it day after tomorrow.

আমার সবচেয়ে দুঃখ বেনিয়া ব্যাটাদের উপর। আমরা তো জানতাম তোমরা গোটা বিশ্বে অত্যন্ত ধুরন্ধর এবং শিক্ষিত। তোমরা রাতকে দিন বানাও দিনকে রাত বানাও। আমরা জানি গণতন্ত্রের সূতিকাগার হলো বৃটেন। কিন্তু গণতন্ত্রের কথা আজ লিখতে বসে তোমাদেরকে লানৎ বর্ষণ করা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। তোমরা ব্যাটা দু'শো বছর ইজি চেয়ারে বসে বসে রাজত্ব করেও এই অশিক্ষিত জাতিটাকে একটুখানি Civilised করতে পারলে না ; এই নির্মম পরাজয়ের জন্য তোমাদের সাজা হওয়া উচিৎ। তোমাদের ব্যর্থতার জন্য শরম করা উচিত।

গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে যিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তিনি আমাদের নয়ণমনি আল্লাহর দোস্ত হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (দঃ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না অথচ দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিলেন। প্রচার করলেন আল্লাহর একাকীত্ব এবং আল্লাহর সৃষ্টি সব সমান।

খোলাফায়ে রাশেদীন মুখে মুখে মুসলমানদেরকে ধর্মের আফিম সেবন করিয়ে বুঁদ করে রাখেননি বরং তাঁরা বহু কষ্ট করে সংযম রক্ষার চেষ্টা করেছেন। হযরত ওমরের কাহিনী আজ আর কারও অজানা নয়। গণতন্ত্র কেমন বিষয় এটা শ্রদ্ধেয় হযরত ওমর জানতেন। তাইতো তাঁকে আমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে স্মরণ করি।

খলিফা হারুনুর রশীদ ছদ্মবেশে ঘুরে এবং দেখে প্রজাদের দুঃখ মোচন করেছেন। অবশ্য হারেমে তাদের সেবাদাসীর সংখ্যা কত ছিল সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কৃষ্ণের ১৬০০ গুপী ছিলো তাতে হয়েছে টা কী?

তার যোগ্যতা ছিল তিনি ফূর্তি করেছেন। তোমার যোগ্যতা থাকে তুমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করো। পাস করো। তুমি ফূর্তি করো। কারও কিছু বলার থাকবে না। এ ছাড়া অন্য সব অভিযোগ নাকচ বলে গণ্য হবে। গণতন্ত্রের বেলায় No hanky-panky. এটা হলো সাফ কথা। অথবা নম্রভাবে বলতে গেলে বলা যায়, এটা শুধু কথার কথা। গল্পে

শোনা যায় ঃ পরলোকগত ভারতের সবচেয়ে দীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইন্টারভিউ দিতে যাবার আগে তার ছেলেকে বলেছিলেন ঃ বাবা, কোন সময় যেন প্রকাশ না পায় যে, তুমি প্রধানমন্ত্রীর ছেলে। অন্য দশ জন যে ভাবে পরীক্ষা দেবে তুমিও সেভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। গণতন্ত্রের এমন পূজারী কজন হয়?

কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ছেলে যখন কলেজ থেকে নির্বাচনী বাক্স ছিনতাই করার পরেও পিতা আরও আস্কারা দিয়ে ছেলেকে যখন মাথায় তুলেন তখন কি গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা থাকতে পারে? পাঠক আমার কথাটি অনুধাবন করবেন।

শ্রদ্ধের মরহুম মানিক মিয়া এবং শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আজীবন গণতন্ত্রের পূজা করেছেন। তাঁদের প্রথম এবং শেষ কথা ছিল গণতন্ত্র। কিন্তু বর্তমানে ও অতীতে দলীয় স্বার্থের খাতিরে কয়েকটি নির্দিষ্ট পার্টি গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করেছেন। নমুনাটা দেখুন। একজন বিশ্বস্ত নিজ দলীয় লোক দিয়ে ১০০ জনের টিকিটে ছাপ দিয়ে ব্যালট বাক্সে ফেলার ব্যবস্থা করা হলো। গণতন্ত্রের উপর এমন ধরনের পাশবিকতা করলে ওর সতীত্ব নষ্ট হবেই।

এসবই হচ্ছে গণতন্ত্রের রংবাজী। অর্থাৎ নেতারা মুখে বলছেন ঃ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং গণতন্ত্রের মর্যাদা আমরা রক্ষা করবই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পূর্ণ রাজতন্ত্র। এবং সময় সময় পূর্ণ অরাজকতা।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চোখ হচ্ছে সংবাদ পত্র। অর্থাৎ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। কিন্তু বর্তমান ও অতীতের সরকার সে রকম কোন শর্ত পালন করেছেন কি? স্বাধীনভাবে কিছু বলতে গেলেই বড় মিয়ারা কখনও চোখ লাল করেন কখনও গোস্বার ভাব ধারণ করেন। ভোটের আগে বড় মিয়ারা ভোটারদের আত্মার আত্মীয় হয়ে যান, কিন্তু নির্বাচনে পাস করার পর নেতার টিকিটও দেখা যায় না। যদিবা দৈবাৎ দেখা হয় নেতারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেন। ভোটারেরা তখন উচ্ছিষ্ট খাবারের মতই অপাংক্তের হয়ে দাঁড়ায়।

একটা গল্প শুনেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক আমেরিকান অধ্যাপক। ভোটের সময় তিনি কয়েকদিনের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করে তার ভোটটি কাষ্ট করার জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন ঃ ভোটটা তাদের নিকট একটা পবিত্র আমানত স্বরূপ। সুতরাং এর মর্যাদা দেয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে One vote = One cigarette and nothing else.

পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শেরে বাংলা ভোটের ক্যানভাসের সময় যুবকদের আশ্বাস দিতেন আমার দল পাশ করলে তোমাদের চাকুরী আমি দেব। পাশের পরে বলতেন ঃ Verbal recommendation has no value একথা শুনার পর আর কারও মুখে রা বেরুত না এ ছাড়া চাকুরীর সুপারিশের জন্য অনেকেই তার নিকট যেত। তিনি সুপারিশও করতেন। কিন্তু সবার চাকুরী হতো না। কারণ সীমিত পদে এগুলো আর কিছুই নয় গণতন্ত্রের রংবাজী। সবাইকে খুশি রাখতে হয়। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের Trade secret. কথায় বলে ঃ A great politician is a great liar. একজন রাজনীতিবিদকে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য প্রার্থীকে ভোটের জন্য অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবে সে সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মোটেও সম্ভব হয় না। একজন democrat

লোককে পাকা মিথ্যাবাদী বলা যায়।

আমার প্রধান দোষ ঃ আমার কথাবার্তা বড় অসংলগ্ন। আমার প্যারাগ্রাফগুলি তাই বেখাপ্পা। সমালোচকের ভাষায় ঃ চড়াই উৎরাই। কখনও হিমালয়ের চূড়া থেকে নেমে আসি সমতলে আবার কখনও সমতল থেকে ছুটে যাই হিমগিরির চূড়ায়। এটা আর কিছু নয়– আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। আমার বক্তব্যকে পরিষ্কার করার জন্য কখনও কখনও আমি আবেগের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে এমন ধরনের অসংলগ্ন কাজ প্রায়ই করে থাকি। সহৃদয় পাঠক আমাকে সেজন্য ক্ষমা করবেন। আবার আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ধরুন আমি যদি গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আকবর বাদশাকে কখনও হরিপদ কেরানীর সাথে তুলনা করি বা এক আসনে বসাই তাহলে কি আপনারা আস্তিন গুটিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসবেন? যদি বা আসেন আমি পিছপা হবো না। কারণ আপনারা এলে অন্যায় যুক্তি নিয়ে আসবেন আমি মোকাবিলা করলে ন্যায়ের জন্য করব। তাছাড়া অজ্ঞ ব্যক্তিরাই সহজে কোন বিষয় আলোচনার ব্যাপারে মাথা গরম করতে ওস্তাদ ; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নয়।

ইমার্সন যথার্থই বলেছেন ঃ Democracy is a Government of the bulles tempered by the editiors, অশিক্ষিতদের দেশে গণতন্ত্র সত্যি অভিশাপ স্বরূপ। কারণ সংখ্যা বেশী হলে গাব গাছ, কলাগাছই অধিকাংশ সময় দেশের নেতা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তাই আমার এক শিক্ষাগুরু রসিকতা করে মনীষী আব্রাহাম লিঙ্কনের কথাটা ঘুরিয়ে বলতেন ঃ কলাগাছ অব দি গভর্নমেন্ট ; কলাগাছ বাইদি গভর্নমেন্ট, কলাগাছ ফর দি গভর্নমেন্ট (Govt. of the people, by the poeple for the people এর অনুরূপ)

বাংলাদেশে এক প্যাকেট বিড়ি বা 'এক শলা' সুরমা সিগারেট দিলে একটা ভোট অতি সহজেই পাওয়া যায়। কারণ এখানকার লোক মাত্রাতিরিক্ত মূর্খ। এমন ধরনের মূর্খদের দেশে গণতান্ত্রিক শিশুর 'টিটেনাস' হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

গণতন্ত্রের merits এবং demreits নিয়ে আলোচনাকালে দেখা গেছে Democracy is the best form of Government and and at the same time worst type of Government, যদি শতকরা ৯৯ জন লোকই শিক্ষিত এবং কর্তব্যপরায়ণ হয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্র অনুকূল পরিবেশ পাবে। কিন্তু শতকরা ৮০ জন লোক মূর্খ থাকলে গণতন্ত্র সেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হতে বাধ্য।

দাক্ষিণাত্যের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হৃদয়ে বড় চোট পেয়ে গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তা হলো ঃ গণতন্ত্র কেবল ঘুমের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ঘুমের সময়, সবাই সমান, সম্রাটও যা পথের ভিক্ষুকও তাই।

কাজেই গণতন্ত্র সম্পর্কে মোক্ষম কথা হলো যারা বুঝে তাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। কিন্তু যারা বুঝে না তাদের কাছে অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কাছে গণতন্ত্র মানে মাথা গুনতি করা। এ সম্পর্কে অনেক গল্প না করে মাত্র একটা উদাহরণ দিলেই গণতন্ত্রের অভিশাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

কোন এক বিদ্যালয়ের ইতিহাসের ক্লাসে শিক্ষক বললেন ঃ বলোতো আওরঙ্গযেবের আগে আকবর সম্রাট ছিলেন না আকবরের আগে আওরঙ্গযেব ছিলেন? এক ছাত্র বলল ঃ আকবর। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই গুরুদেবেরও প্রকৃত বিষয়টা জানা ছিল না। আর

একজনকে বললেন, তুমি বলো। অন্য এক ছাত্র বলল ঃ আওরঙ্গযেব। বাধলো গণ্ডগোল। শিক্ষকের মনেও ঢুকলো সন্দেহ। তিনি প্রস্তাব দিলেন ঃ তা হলে ভোট হোক। ভোটে দেখা গেল বকলমদের সংখ্যাই বেশী। গণতন্ত্রের জয় হলো। সত্য চাপা পড়ে রইল। তাই কেউ কেউ বলেন গণতন্ত্রের অপর নাম ভাঁওতাবাজি বা ভাঁওতাতন্ত্র। রম্য লেখকদের মতে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে একটা রংবাজী করা।

গণতন্ত্রের নাম ভাঙিয়ে যারা নিরীহ জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি ঃ তোমরা গণতন্ত্রের ভাঁওতা দিয়ে আর ঠকাবার চেষ্টা করো না। কারণ ঃ Democracy is based upon the conviction that there are extra ordinary possibilities in ordinary people (Fosdik) ["গণতন্ত্রের বুনিয়াদ এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা বিদ্যমান।"]

গণতন্ত্রের নাম দিয়ে সবাই আমাদেরকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে Theodor Parker এর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। গণতন্ত্রের অর্থ এই নয় যে, তুমি যতটা ভাল আমিও ততটা ভাল। বরং গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে আমি যতটা ভাল তুমিও ঠিক ততটাই ভাল।"

ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত থাকতে চায় তারা মুখে ভাল ভাল কথা বলবে কিন্তু সেই কথাগুলি বাস্তবায়িত করে না। গণতন্ত্র তখন সাধারণ মানুষের কাছে সেই রাক্ষসকবলিত রাজ কন্যার মতই নিছক সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রদর্শিত হয় ভোগ করা যায় না।

রাক্ষসরূপী ষোড়শ লুই বলেছেন ঃ "তোমরা সবাই আমার মত হও। কারণ, আমি—সর্বোত্তম। আমিই দল। আমিই রাষ্ট্র।"

বড় মিয়াদের কাছে আমার একটি মাত্র প্রশ্ন—রাক্ষসরূপী গণতন্ত্র দিয়ে আমরা আর কতকাল তাড়া খাওয়া হরিণের মত রুদ্ধশ্বাসে ছুটবো?

কেমন আছি

আমি এখন আর আগের মত কাউকে বলি না—কেমন আছেন? পরিবর্তে বলি ঃ কত 'পার্সেন্ট' খারাপ আছেন? আমিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি এই সিস্টেমটা চালু করার চেষ্টায় আছেন।

এখন কোন বন্ধু আমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করলে আমি বলি ঃ আমি 'সেভেন্টি পারসেন্ট' কিংবা 'নাইনটি পারসেন্ট' খারাপ আছি। কারণ যে দিনকাল পড়েছে তাতে করে এখনও যে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে রাজধানীর বুকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছি এটাই আমার 'ফোরটিন জেনারেশনের পরম, সৌভাগ্য।

আমার মনে হয় আমরা যারা নির্ধারিত আয়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তারা অষ্টপ্রহর একটা শ্বাসরোধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছি। কবির ভাষায় এই রকম অবস্থার নাম বোধহয় 'শুধু দিন যাপনের গ্লানি।'

ঘরের কথা পরকে বলে লাভ নেই তবু বলছি। কারণ যন্ত্রণার কথা কিছু বললে নাকি

নিজেকে অনেকটা হাল্‌কা মনে হয়। আমার ধারণা আমার মত আপনারাও অনেকেই যন্ত্রণাবিদ্ধ। আসুন সে যন্ত্রণার কিছু-কিঞ্চিৎ আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেই।

প্রথমেই বাজার দিয়ে আরম্ভ করা যাক। থলেটা হাতে করে আস্তে আস্তে বাজার অভিমুখে চল্‌লাম। পথ চলতে চলতে ভাবতে লাগ্‌লাম সৃষ্টিকর্তা কি আমাদেরকে নিয়মিত বাজার করা আর রেশন তোলার জন্যই পয়দা করেছেন? এর বাইরে কি কিছুই করবার বা ভাববার নেই? আমাদের বিশাল পৃথিবী কি শুধু ফকিরেরপুল আর খিলগাঁও বাজারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? প্রথমেই ঢুঁ মারলাম মাছের বাজারে। কিন্তু একি? মাছপট্টি একেবারেই বিরাণ! যা দু'এক ডালায় আছে তাও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ভাবলাম পরিবার পরিকল্পনা সমিতির লোকজন বোধহয় মৎস্যকন্যাদের উপর মায়া বড়ির পরীক্ষা চালিয়েছেন—তা না হলে মাছের বাজারে এত অকাল পড়বে কেন?

আলু, পটল, ঝিংগা, শশা, পালং শাক প্রভৃতির মূল্য বলে আপনাদেরকে আর লজ্জা দিতে চাই না। একটি দৃশ্যের কথা বলছি—মাফ করবেন দার্জিলিং বা কক্সবাজারের দৃশ্য নয়—ঠাটারি বাজারে দুধওয়ালাদের দৃশ্যের কথাই বলছি। একজনকে বললাম দুধের দাম কত (অর্থাৎ সের কত)? সে বলল ঃ ছয় টাকা। আরেকজনকে বললাম তোমার দর কত? সে একটু কটমট্ করে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম, এভাবে আমার দিকে চেয়ে কি দেখছ? আমি কি কোন অদ্ভুত জীব-জানোয়ার? আমি বলছি তোমার দুধের দাম কত? সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দিল এটা তো-গাই-এর দুধ, আমি দুধ পামু কই? যাই হোক শেষমেস সে বলল ঃ আমার দুধের সের চার টাকা। আমি বললাম ঃ কি ব্যাপার? ও চাইলো ছয় টাকা। তুমি চাচ্ছ চার টাকা এর কারণ কি বাবা? আমার বোধগম্য হচ্ছে না। একজন বলল ঃ এই সোজা হিসেবটা বুঝলেন না? যে দুধ ছয় টাকা সের তার মধ্যে পানির ভাগ ফোর্টি পারসেন্ট আর যেটার সের ৪ টাকা তার মধ্যে পানির ভাগ সিক্সটি পারসেন্ট। ব্যাপারটা আমার কাছে ফর্সা হয়ে এলো। আমি আমার সীমিত জ্ঞানকে কয়েকবার লানত বর্ষণ করলাম। তারপর গেলাম কিছু গরম মশলার জন্য। দোকানদারকে বললাম আট আনার গরম মশ্‌লা দেন। দোকানদার বললেন ঃ সায়েব আট আনার গরম মশ্‌লা দেয়া যায় না। কমপক্ষে এক টাকার নিতে হবে। তাতেই রাজি হলাম। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। দোকানদার যখন এলাচী দিচ্ছিলেন তখন মনে হলো তিনি সেগুলো যক্ষের ধনের মত আগ্‌লে রেখেছেন। যাই হোক তাকে বললাম কালিজিরার সের কত? তিনি বলেলন ঃ ২৪ টাকা সের। অথচ তার আগের দিন এক বন্ধু গ্রামের বাড়ী থেকে এসে বললেন ঃ গ্রামে ৮/১০ টাকা সের। নিজে নিজেই সমীকরণ করলাম, শহরে কোন খাদ্যদ্রব্য এলেই সে জিনিস সোনায় পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয় নিয়ে তাজা ব্রেইনটাকে অকেজো করার কোনো মানেই হয় না। সুতরাং বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলাম। এবার একটি বিষয় পেয়েও গেলাম।

এবারে আসুন চিত্তবিনোদনের ব্যাপারে। নাটক বা সিনেমা দেখতে যাবেন? যাবার আগে পকেটটা ভালোভাবে পরখ করে নেন। তারপরেও কথা আছে। সিনেমা হলে গেলেই যে আপনি ছবি দেখতে পাবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আজকাল টিকিট নিয়ে বহুত ঘাপলাবাজি চলছে এবং এটা এত সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বিকারহীনভাবে নিশ্চুপ থাকেন। যদি বা ছবিঘরে ঢুকলেন সেখানেও অশান্তি আর বিতৃষ্ণায় আপনার মন ভরে উঠবে। কারণ অধিকাংশ ছবির কাহিনীই বিদেশী ও প্রতিবেশী

ভারতীয় বই এর চুরি করা কাহিনী। আরেকটা মজার ব্যাপার, এসব চুরি করা কাহিনীগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এদেশেরই কয়েকটা পত্রিকা সর্বক্ষণ সোচ্চার। খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি? চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক কিম্বা উদ্যানেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু সেখানেও বি. আর. টি. সি.'র যাত্রীর মত 'হেভি রাশ'। উদ্যানে অবশ্য জায়গা আছে কিন্তু সেখানেও আপনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কপোত-কপোতীর ভিড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বেন। এ ছাড়া স্টেডিয়ামে টিকিট কেটে খেলা দেখার মত সময় এবং সামর্থ্য আমার নেই। তবে আমি নিশ্চিত আপনাদের অনেকেই না খেয়ে হলেও খেলা দেখবেন। নেশা কতক্ষণ চেপে রাখা যায় বুলন? তবে চিত্তকে খুশী রাখুন, তাজা রাখুন, এটাই কামনা করছি।

কত কিছুই তো মনে হয়। কলম দিয়ে অনেক কাহিনী লিখতে ইচ্ছে করে, মনের ক্যামেরা দিয়ে অনেক ছবি তুলতে ইচ্ছে করে, অনেক পীড়াদায়ক কাহিনীর প্রতিবাদও করতে ইচ্ছে করে কিন্তু সব ইচ্ছেরই কি প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব? অর্থনীতির ভাষায় বলা যায়ঃ 'ইচ্ছাটাই যদি ঘোড়া হতো তা হলে তাবৎ ভিক্ষুকই ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতো।' তাই অনেক ইচ্ছেকে গলাটিপে হত্যা করতে হয়, অনেক কিছুই না বলা রয়ে যায়। কবিগুরু একবার বলেছিলেনঃ 'ছবি আঁকার চেয়ে না আঁকা ঢের শক্ত কাজ।'

আমাদের আশে পাশে শত অভাব বোয়াল মাছের মত সর্বক্ষণ 'হাঁ' করে আছে। কবে এই বোয়াল মাছটার বিরাট মুখ বন্ধ হবে জানি না। তবে এও জানি সেই ভয়ঙ্কর বোয়ালটার আধার আমরাই—অন্য কেউ নয়। মানুষ বোধহয় তার প্রথম প্রেমকে ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারে না। কেন পারে না আমি জানি না। কিন্তু মানুষ যখন অসীম অভাবে নিমজ্জিত থাকেন তখন কোন প্রকার প্রেমই বোধহয় তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। কাজেই এই মুহূর্তে আমার প্রথম প্রেমের প্রিয়ার কাছে বক্তব্য হলো এইঃ

"জানিতে চেয়ো না তুমি বারে বারে
কেন একা পড়ে থাকি এই আঁধারে
আমার জীবনে কেন দীপ জ্বলে না
কেমন আছি জানতে চেয়ো না।"

সঞ্চয়ের গুরুত্ব

ছোটবেলা থেকেই আমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তা হলো এইঃ ঘরে খাবার না থাকলে ক্ষুধা বাড়ে কিন্তু ঘর-ভর্তি খাবার থাকলে ক্ষুধার কথাও মনে থাকে না, খোদার কথাও মনে থাকে না। কাজেই সঞ্চয় বলতে শুধু যে টাকা-পয়সা সঞ্চয় করতে হবে এমন কথা নয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়েরও একটা ব্যাপার আছে কিংবা থাকা উচিত।

আমি ব্যক্তিগত জীবনে দুটো জিনিসকে ভয় পাই—একটি হলো ক্ষুধা এবং অন্যটি খোদা। ক্ষুধাকে জয় করার জন্য সঞ্চয় করি পণ্য এবং খোদাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সঞ্চয় করি পুণ্য। এ জন্য আমি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি করে ভালো কাজ করি।

বাংলা জনপ্রিয় একটি প্রবাদ আছে, "তিল তিল করেই তাল হয়।" এমনি ধরনের আরো অনেক প্রবাদ আছে ; যেমন ঃ 'কচু গাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়', 'গাইতে

গাইতে গায়েন হয়', 'বাজাতে বাজাতে বাজিয়ে হয়,' কেউ যদি নাদানের মত আমাকে প্রশ্ন করে বসেন কচু গাছ, ডাকাত, গায়েন এবং বাজিয়ের সংগে সঞ্চয়ের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? উত্তরে বলব এবং বিনীতভাবেই বলব প্রত্যেকটি কাজের পেছনেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা একান্ত অপরিহার্য। রাতারাতি কেউ নিউটন কিম্বা আইনস্টাইন হ'তে পারেন না, শেক্সপীয়ার কিম্বা রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল কিম্বা নজরুলও হতে পারেন না। বোধকরি খোদা এসব কাজে সাহায্য করেন না। কারণ তিনি আগেই ওয়াদা করেছেন ঃ যে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে না আমি তাকে সাহায্য করি না। অতএব যাই কিছু করুন—অভিজ্ঞতার তহবিলে সঞ্চয় আপনাকে করতেই হবে। সঞ্চয় বলতে আমি সঞ্চয় করার অভ্যাসটাকেই বোঝাতে চাচ্ছি। এই অভ্যাসটা যখন নেশায় পরিণত হবে তখন দেখবেন আপনার টাকার থলেটা ধীরে ধীরে বেলুনের মত ফেঁপে উঠছে। এই উজ্জ্বল বৃদ্ধি দেখে আপনার মনেও দোলা লাগবে।

ধরা যাক আমি একটি ছেলেক শিক্ষা দান করবো অথবা অক্ষর দান করবো। তাহলে আমাকে ভাবতে হবে প্রথমে আমার কি করণীয়। আমার মতে সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রতি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা। পরবর্তী পর্যায়ে যেন সে-ই শিক্ষককে শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করে। তারপর একদিন দেখা যাবে শিক্ষার আলোকে গোটা দেশ প্লাবিত হয়েছে।

সঞ্চয়ের কথা বলতে গিয়ে আমরা কোন ক্রমেই কবির সেই বিখ্যাত লাইনগুলোর কথা বিস্মৃত হতে পারি নাঃ

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।"

কথাটা আমি আরো প্রাঞ্জলভাবে বলতে চাই এভাবে ঃ এক ফোঁড়ের পর আর এক ফোঁড় দিলে বিরাট নক্সি কাঁথা তৈরি হয়, তেমনিভাবে এক পদক্ষেপের পর আরেক পদক্ষেপ দিলে বিরাট পথ অতিক্রম করা সম্ভব। মানুষ তো আর জ্বীন নয় যে এক লাফেই এক মাইল পার হবে?

সঞ্চয় মনের প্রশান্তি বাড়ায়। যেহেতু মনের সাথে দেহের সম্পর্ক নিবিড় সুতরাং সঞ্চয় দেহকেও সুস্থ রাখে। আর দেহমন সুস্থ থাকলে বিশাল পৃথিবীকেও সুস্থ স্বাভাবিক এবং সুন্দর মনে হয়। মেয়েরা যখন কোন ছেলেকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পেতে চায় তখন ছেলেদের চারটা বিষয়ের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকে। তা হলো ঃ বিউটি, ব্রেইন, বার্থ এন্ড ব্যাংক। কিন্তু মূর্খ আর কাকে বলে। কোন ছেলের ভিতরেই এই চারটি বিষয়ের সমন্বয় দেখা যায় না—এটা অনেকটা অলীক বিষয় আর কি? শেষমেস মেয়েরা যোগ-বিয়োগ করে ছেলের ব্যাংক ব্যালান্সটাকে কেন্দ্র করেই তার গলায় ঝুলে পড়ে এবং ছেলের কষ্টার্জিত অর্থের বারোটা বাজায়। ভাগে একটু উনিশ-বিশ হলেই বিষাক্ত ছোবলে সোজা-সরল গোবেচারী ছেলেকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। তারপর ক্রমাগত বিষ পান করার ফলে এক সময় সেই রোমান্টিক ছেলে বা ছেলের দল নীলকণ্ঠ সেজে বসে থাকে।

আমার বক্তব্য ঃ সঞ্চয় করলে ইহকালেও মঙ্গল, পরকালেও মঙ্গল। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে আপনার একমাত্র হাতিয়ার হ'ল সঞ্চয়। সাংসারিক জীবনে সঞ্চয়ের অভ্যাসটাকে জাগিয়ে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। আমি আমার নিজের কথাটাই বলি। আমার বই কেনা, বইপড়া এবং বই সংরক্ষণ করার অভ্যাসটা ছোট বেলা থেকেই প্রবল।

ফলে আমার বাসায় এখন আর বই রাখার মত জায়গা নেই। আমার গিন্নী ২৪ ঘন্টা এটা নিয়ে প্যান প্যান করে কিন্তু তাতে কার কি আসে যায়। অধিকাংশ মহিলাই তো সংসারের বোঝা-স্বরূপ। এভাবেই আমি আমার বাসার মধ্যে একটি গ্রন্থের ভুবন রচনা করেছি। বিভ্রান্ত হলেই আমি এর তলায় ডুব দেই। মাঝে মাঝে ভাবি এভাবে কিছু টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে পারলে বেশ মজা হতো। কারণ কাব্যরসের সাথে খাদ্যরসের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এবং সেই খাদ্যরসের সঞ্চয় করতে অনেকগুলো কাঠ-খড় অবশ্যই পোড়াতে হয়।

একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে এই কথাগুলো সাধারণভাবে চিন্তা করলে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারি। সেই ধারণাটা সঞ্চয়ের জন্য সহায়ক—হ্যাঁ বিশেষভাবেই সহায়ক। যেমন অসংখ্য তারা আছে বলেই আকাশটা এত সুন্দর, অনেক ফুল আছে বলেই বাগানটা এত সুন্দর, তেমনিভাবে বলা যায় বিচিত্র ধরনের মানুষের সমাবেশ আছে বলেই পৃথিবী এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত।

একটা সুন্দর প্রতিমা তৈরি করার জন্য অনেকগুলো উপাদনের প্রয়োজন হয়। একটি মাত্র উপাদান দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা যায় না। খড় লাগে, রং-এর দরকার হয়, কাপড় লাগে, কৃত্রিম চুল লাগে সেই সংগে প্রয়োজন হয় একজন পুরোহিত বা কুমোর। এবং ভালো প্রতিমা বানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কুমোরকে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়। রং-এর ব্যবহার বা প্রয়োগবিধি শিখতে হয়।

বাস্তব জীবনেও আমরা এই দৃষ্টান্তকে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করতে হলে আমাদের অনেক কিছু সঞ্চয় করতে হয়।

আমি সারাক্ষণ একটি সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি। এটা আমার অবাস্তব কল্পনা নয়। বরং অতি বাস্তব। আমার মত অনেক লোক এ ধরনের কল্পনায় বিভোর থাকেন।

প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য এক দাবাড়ুকে চাল শিখতে হয়, সংগীতজ্ঞকে আয়ত্ত করতে হয় তান, লয়, মান ; খেলোয়াড়কে আয়ত্ত করতে হয় নানাবিধ কৌশল, উকিলকে অর্জন করতে হয় আইনের প্যাঁচ, রাজনীতিবিদকে কব্জা করতে হয় কূটনীতির জাল, কবিকে হতে হয় শব্দ ও ভাবের যাদুকর, ড্যানসারকে আয়ত্ত করতে হয় নাচের বিবিধ মুদ্রা—সবগুলোর অন্তরালেই একটা বিষয়ই কাজ করছে সর্বক্ষণ—তা হলো সঞ্চয়ের অভ্যাস অথবা অভ্যাসের সঞ্চয় যাই বলুন।

আলোর নীচে অন্ধকার

অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো। পত্রিকার একটি সংবাদ—বিষয়বস্তু হলো, সেগুনবাগিচার একটি পচা পুকুরের ছবি। নীচে ক্যাপসান লেখা "স্বচ্ছ হলেও বিষাক্ত।" কেন যেন সামান্য এই বিরোধমূলক বাক্যটি আমাকে বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশেও বিদ্রোহী করে তোলে। আমার চিন্তার জগতে ছোট্ট এই বাক্যটি একটি নূতন দিগন্তের সূচনা করে।

আমরাতো হরহামেশাই বলে থাকি, আমরা সভ্য জগতের নাগরিক। আমরা আগের

চেয়ে অনেক বেশী সভ্য হয়েছি।

আমরা বর্তমানের আলোকে অতীতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সমরনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার চুলচেরা বিচার করি এবং তুলনামূলকভাবে বর্তমান অবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই। কিন্তু বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজমান তা'কি প্রশংসার দাবীদার?

আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা জিনিস বিশ্বাস করলাম যে, কোন উচ্চ শিক্ষিত লোকের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় সংঘঠিত হতে পারে না। ভাবতাম, যারা ছোট বেলায়—

"নীতি এই যথাতথা
বল সদা সৎ কথা।"

পড়ে তারা বড় হলে কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলবে এ কখনো সম্ভব নয়। এটা অনভিজ্ঞ মনের একটা অভি প্রকাশও বলতে পারেন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবেই যে গলদপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য। কথাটা উদাহরণ সহযোগেই বললে আরও পরিস্কার হবে। আমাদের মুরুব্বীরা ছোট বেলায় আমাদের এই বলে তালিম দেন যে—'কখনও মিথ্যা বলিও না', 'চুরি করা অপরাধ' 'ধূমপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অনুরূপভাবে অন্য কোন উন্নতিশীল দেশে যেখানে শতকরা ১০০ জনই শিক্ষিত এ ধরনের তালিম দেওয়া হয় কি না আমাদের জানা নেই। 'কখনও মিথ্যা বলিও না' এর অর্থ ছোট বেলা থেকেই মিথ্যার সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বরং এটা অপ্রকাশিত থাকাই ভাল ছিল।

কিছুদিন আগের আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে, সিরাজগঞ্জ লাইনের ট্রেন দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মরহুম রাজনৈতিক কল্পনা নেতা বলেছিলেন অভিধানে 'দুর্ঘটনা' নামক একটা শব্দ যখন আছে তখন দুর্ঘটনা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।' কথাটা যুক্তিমূলক হলেও এর ভিতর মানবতা অনুপস্থিত। যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় বলেই আমাদের ধারণা সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দুঃখ প্রকাশ তো দূরের কথা যুক্তিটাই প্রবল হয়ে ওঠে। এমন ধরনের যুক্তি সত্যি পীড়াদায়ক।

সমাজের এক প্রকার শিক্ষিত লোক আছেন, যারা মুখে উপদেশের ফুলঝুরি ছড়ান কিন্তু ভিতরে গরল ভর্তি। এদেরকে সংশোধনের কোন উপায় নেই। কারণ এদের পেট ভর্তি যুক্তির দু'ধারী তলোয়ার সদা সঞ্চারমান।

সেকালের লোক অশিক্ষিত হয়েও কাউকে কোন কথা দিলে সে কথার নড়চড় হতো না। কিন্তু একালের লোক শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সকালে কথা পাকাপাকি করলে বিকেল বেলায় তা বদলিয়ে দেয়। তাই একটা প্রাচীন প্রবাদও গড়ে উঠেছে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।' কিন্তু বর্তমানে যা দেখা যায় তা হলো, "হাকিম নড়ে, হুকুমও নড়ে।"

আরেকটি সমস্যা হলো আধুনিকতা এবং উগ্র-আধুনিকতার নাম ভাঙিয়ে বর্তমানে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক এক ক্ষতিকর আনন্দে মশগুল, তাদেরকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায়—'উই আর মর্ডান'। তাদের চেয়ে আরেক কাঠি যারা সরস তারা বলেন, 'উই আর আলট্রা মডার্ন'। এমন্বিধ এক গোঁজামিলের ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে। এখানে কল্যাণমূলক কিছু বলতে গেলেই অত্যাধুনিক শ্রেণীর রুক্ষ মেজাজের সেই বুলি শোনা যাবে 'হট ইজ আউট ডেটেড'।

আজ যারা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক তারা যদি সর্বহারা শ্রেণীকে উপেক্ষা করে গণ-সাহিত্যের বিলুপ্তি ঘটান তাহলে তারাও ইতিহাসের পাতায় গণধিকৃত হবেন। এ শিক্ষা আমরা অতীতের শিক্ষা থেকেই লাভ করেছি। কবিগুরুর সেই বাণী এখানে তাই প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করছি; "হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে/কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।"

আমাদের সমাজে এক প্রকার উন্নাসিক লোক আছেন যাঁরা নিজেকে অত্যাধুনিক ভেবে সব কাজকর্মগুলিকে এড়িয়ে চলতে পারলে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। আমার মনে হয় তাঁদের জন্য এরিস্টটলের এই সামান্য বাক্যটি কিছুটা কাজে লাগতে পারে। তা হলো ঃ "নলেজ ইজ নাথিং বাট দি এক্সপেরিয়েন্স অব দি পাস্ট।"

কোন আধুনিক লোক কিংবা একটা গোষ্ঠী মনে করেন আমি বা আমরা যা ভাবছি বা করছি সেটাই সর্বরোগের মহৌষধ। এতে আর কারো ভাববার বা করবার কিছু নেই তা হলে সেটাই কি অকল্যাণমূলক নয়? বিচারের ভার সুধীমণ্ডলীর ওপরই ছেড়ে দিলাম।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড কিনা এখন ভাববার অবকাশ আছে। মানুষ এখন আর এ রকম আপ্ত বাক্যে তুষ্ট থাকতে রাজি না। কারণ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ করে প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ স্তর পর্যন্ত সর্বত্র এত ক্ষোভের সঞ্চার হতো না। অর্থনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে পতিত হওয়ায় এখন তারা শিক্ষাকে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে নারাজ।

যে পুঁজিপতিরা কৌশলে সমাজতান্ত্রিক বুলি আওড়াচ্ছেন এবং শ্রমিকের রক্ত শোষণ করছেন নিশ্চয় তাঁরা অশিক্ষিত নন অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রবক্তরা সমাজতন্ত্রের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা লুটছেন। এদেরকে বাইরে থেকে দেখতে পরিষ্কার মনে হলেও এদের ভিতরে গরল। এরা ভয়ানক। এরা বাইরে বন্ধু-ভিতরে বিষাক্ত। এই সব ছদ্মবেশী থেকে সাবধান থাকা ভাল।

কথায় বলে বড়লোকের কার্পেটের নীচে অনেক ধূলো জমে থাকে, দর্শক সেটা চোখে দেখে না। যদি বা কখনও দেখে বলতে সাহস করে না।

আমরা কতকগুলো লোক অন্ধ সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ, তাই নতুন কিছু সৃষ্টি করার পেছনে সবখান থেকে আসে বাধা আর বিপত্তি। শিক্ষার আলো আমাদেরকে সংস্কারমুক্ত করতে পারে না। আলোর নিচে বিরাজ করে অন্ধকার।

যখন পোকায় কিছু কাটে

রাত ঘনীভূত হচ্ছে ক্রমান্বয়ে। ঘরে আমি একা। ভয়ঙ্করভাবে একা। একাকীত্বের যন্ত্রণায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। জড়সঙ্গী পুরো টেবিলকে তাতার সৈনিকের মত গ্রাস করে পোকারা যেমন আগ্রাসীরা গ্রাস করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। পোকার কুটুর কুটুর একটানা শব্দগুলো আমার সমস্ত অস্তিত্বকে একেবারে লেপ্টে লেপ্টে গ্রাস করে ফেলছে। আমি যন্ত্রণাকে ভোলার জন্য আপাততঃ নীরবতায় নিমগ্ন, অনেকটা উঠ পাখির

বালিতে ঠোঁট গুঁজে দেয়ার মত। অস্বস্তিতে সারা দেহ মন বিষিয়ে উঠেছে। অথচ প্রতিকারের সামান্যতম উপায়ও নেই। পোকা দমন করার কোন প্রযুক্তিই আমার জানা নেই। সহকর্মী জামাল ভাইকে বলেছি—এই কাঠের টেবিলটাকে বার্নিশ করার জন্য। পোকায় যখন টেবিলটা কাটে তখন বার বার প্রতিজ্ঞা করি ঃ আগামীকাল টেবিলসহ অন্যান্য আসবাবপত্র বার্নিশ করতেই হবে। নতুবা নির্দিষ্ট সময়ে টেবিলটি জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে পড়ার মত অকস্মাৎ ধসে পড়বে। তারপর নিয়মিত সূর্য ডোবে আর উঠে। নবীন গায়ক গলা সাধে, প্রবীণ গায়ক রেয়াজ করে, গণিকারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সং সেজে খদ্দের খোঁজে। বেসরকারী-সরকারী কর্মচারীরা নিয়মিত অফিস করেন, রাখাল ছেলেরা ধেনু নিয়ে মাঠে যায়। মা-বোনেরা কেউ পাকশালায়, কেউ বা পাঠশালায়, কেউ বা মেক-আপে মনোনিবেশ করে। টেবিল আর বার্নিশ হয় না। যেমন দেশটা। গোটা দেশটাকে মনে হয় একটি নিরেট কাঠের টেবিল। জানা, দেখা, পরিচিত পোকারা মৃদু শব্দে দেশরূপী টেবিলটাকে অহর্নিশ কুরে কুরে খাচ্ছে। কিছুই বলছি না এর বিরুদ্ধে। এ কেমন ক্লীবতা? ঘৃণায়, ব্যর্থতায় আমি কেবল নাসিকা কুঞ্চিত করছি। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না, পারছি না, পারছি না। আদৌ কি পারব না?

শিশু-কিশোর গ্রন্থমালা
সহ নবীন ও তরুণ প্রজন্মের
লেখাকে স্বাগত জানিয়ে ব্যতিক্রম প্রকাশনী তার
কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্ভাব্য সকল শাখায় বিচরণ করে
এদেশের প্রকাশনায় নতুন মাত্রা সংযোজন
করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
তাই নিয়মিত প্রকাশিত হবে
জীবজগতের বিচিত্র বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থমালা।
বইগুলো আপনাদের ভাল লাগলে ব্যতিক্রম
এর উদ্যোগ সফল হবে।